অসাধ্য সাধন

নিরুপমা-পুরস্কার

ষষ্ঠ বর্ষ।

অসাধ্য-সাধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছেলেবেলা থেকেই "দুষ্টু ছেলে" বলে গ্রামে একটা সুখ্যাতি ছিল শুনেছি—আমার মতন একগুঁয়ে, আমার মত ডাংপিটে, আর কেউ ছিল বলেও শুনিনি—যদিও এ বৃদ্ধ বয়সে আমার বাঙ্গালাব্যাপী যশঃ তাহার বিপরীতগামিনী।

কেন যে এত দুষ্ট ছিলাম তা এখনও বুঝতে পারি না—জ্ঞান হয়ে অবধি বিশেষ যে কোন দুষ্টামী করেছি তা মনে পড়ে না—মনে পড়ে আমার অকুতোভয়—আমার সাহস যথেষ্ট বেশী ছিল; তার কারণ আমার বেশী দায়ীত্ব ছিল না। আশৈশব আমি বন্ধনবিহীন। এই নিরাত্মীয়তা আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে কত যে মর্ম্মপীড়া দিয়াছে, এই স্তিমিতদৃষ্টি ক্ষীণচক্ষুদুটী হইতে কত যে জল ফেলাইয়াছে তাহা আজ আর বলিব না—কারণ তাহা হইলে যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহা আর বলা হইবে না।

নিরুপমা-পুরস্কার।

অতি শৈশবে এই পিতৃমাতৃহীন বালকটীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এক দূর-সম্পর্কীয় দাদামহাশয়। তাঁহার ঋণ শোধ করাতো পরের কথা—চেষ্টা করিবার অনেক পূর্ব্বেই তিনি সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পবিত্র-স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারি নাই।

তারপর কেমন করিয়া যে এন্ট্রান্স পাস করিয়া কি সাহসে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়াছিলাম তাহা নিখুঁত ভাবে মনে না পড়িলেও এটা বেশ জানি যে বরাবর পরের দয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম। যখন fifth year এ পড়িতেছি তখন দাদামহাশয়ের মৃত্যু হয়, সুতরাং আর পড়া সম্ভব হইল না—কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব কি গুণে জানিনা এ হতভাগাকে বড় ভালবাসিতেন; শুনিতাম তিনি বলিতেন এনাটমী আর সার্জ্জারীতে শেখরকুমারের জোড়া নাই। মনে পড়ে বটে দু'একটা খুব শক্ত অপারেশন পাঠ্যাবস্থায় বেশ কৃতীত্বের সহিত করেছিলুম—যাইহোক্ তাঁরই আশীর্ব্বাদে আজ ডাঃ এস কে বসুর নাম কলিকাতায় কোন সার্জ্জনের নীচে নয়—এ আত্মশ্লাঘা টুকু করিবার উদ্দেশ্য, নিজের তৃপ্তি নয়; কারণ এখন আমি তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার বাহিরে এসে পড়েছি—উদ্দেশ্য; সেই মহাপুরুষের কথা বিবৃত করা, যার কৃপায় আমি হীন ভিক্ষুকের মত অবস্থা থেকে এই রাজার মত ঐশ্বর্য্য, এই ভারতব্যাপী সুখ্যাতি অর্জ্জন কর্ত্তে পেরেছি—এবং যদি কিছু পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে থাকি তো সে তাঁহারই আশীর্ব্বাদে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন পড়া অসম্ভব হ'ল, তখন একদিন Principal সাহেবের বাসায় গিয়ে সব বললুম—আমার ব্যাপার শুনে বললেন "দেখ শেখর পরীক্ষার আর ৩।৪ মাস বাকী—পরীক্ষাটা দিতে পারলেই ভাল হোত—কিন্তু যদি কিছু মনে না কর তো এ ক'টা মাসের খরচ তোমায় আমি দিতে বড় আনন্দিত হব। আমার ভিতরের মানুষটা বড় গর্ব্বী, সে আর সব সইতে পারে, নীচু হতে জানে না—সে তাঁহাকে বললে "আপনি আমায় পুত্রাধিক স্নেহ করেন তা আমি জানি—কিন্তু মাপ করবেন সাহায্য আমি আর কারু নেব না—আর পাস—" "পাস তুমি হতেই কিন্তু তোমার ছাপের আবশ্যক নাই। বলতে পারি না বাবু খাঁটী জিনিসের আদর তোমাদের দেশে আছে কিনা—কিন্তু পাস যারা করবে, তুমি তাদের ঢের উঁচুতে আছ; তবে এক কাজ কর—যদি পড়া ছাড় তো প্রথমে একটা চাকরী—" "না সাহেব চাকরী করতে হুকুম করবেন না—আমার চাকরীতে প্রবৃত্তি নাই—বাঙ্গালীর ছেলে চাকরী করে করে—" "অধঃপাতে গেছে তা জানি এবং যারা পাশ করবে তাদের মধ্যে পাশকরা ৮০টী ছেলেই চাকরী কর্ত্তে পেলে বর্ত্তে যাবে—তাহলেও তোমার কথা স্বতন্ত্র, তোমার যা অবস্থা বলছ Back কর্ব্বার কেউ নেই। কলিকাতায় Practice জমতে সময় চাই, ততদিন তোমার চলা চাই। তার উপর তোমার অভিজ্ঞতা নেই। আমরা তোমাদের যা শিখিয়েছি তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। একবার অনেক রোগী নাড়াচাড়া করতে পেলে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, আর নইলে দুচার বছর Practice

জমবার অপেক্ষায় থাকৃতে থাকৃতে সব মর্চ্চেধরে অব্যবহার্য্য হয়ে যাবে।" "সেটা খুবই ঠিক—তাহলে আপনি কি কর্ত্তে উপদেশ দেন।" "উপদেশ আমি দিইনা—তবে একটা সজেশন দিতে পারি—আমার একটী বন্ধু খুব বড় একটী ষ্টীমার কোংর ডাইরেক্টর, তাঁর নামে আমি তোমায় একটা পরিচয়পত্র দেব—তাঁরা অনেক ডাক্তার নেন, সেখানে উপস্থিত একটী কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়; এতে তোমার অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং অনেক দেশ বিদেশ বেড়ান হবে; তারপর হাতে কিছু টাকা নিয়ে কলিকাতায় Practice কর্ত্তে বস। চিঠিটা শুধু তোমার পাশের certificate নেই বলেই দিতে চাইছি"। "ধন্যবাদ—আমার অশেষ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য।" "কিছু বলতে হবে না শেখর—আমি তোমায় খুব ভালই জানি—দেখো আমার কথা ঠিক ফলবে; তুমি পাশ না হইলেও একদিন তোমার নাম ভারতব্যাপী হবে, আমি ইস্পাত ও লোহা চিনি—আমি ও নিজের তৈরী মানুষ; আজ এস, কাল ২ টার সময় তোমার চিঠি তৈয়ার থাকৃবে।

হায় গুরুদেব! আজ যদি তুমি জীবিত থাকিতে তো দেখতে, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"তুমি যাবে বঙ্গে তোমার কপাল যাবে সঙ্গে" বাস্তবিকইপ্রিন্সিপাল সাহেবের এত দয়াতেও আমার দুর্গতি মোচন হইল না—চাকরী ভালই পাইয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না।—ষ্টীমারের প্রথম ট্রিপেই আমার দুরদৃষ্ট আমাকে গ্রাস করিয়া বসিল—পথিমধ্যেই আমার গায়ে বসন্ত বাহির হইল, রোগের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম; যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম রেঙ্গুণের এক হাঁসপাতালে। প্রায় ১ মাস পরে যখন হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইলাম, তখন আমাতে ও রাস্তার ভিখারীতে বড় বেশী তফাৎ ছিল না—হাঁসপাতালে ডাক্তার বাবুটীর সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ হইয়াছিল, তাঁহাকে সমস্ত দুঃখের কথা বলিলাম,—ভদ্রলোক বলিলেন এখানে প্র্যাকটিস করা বড় ব্যয়সাধ্য, কারণ এখানে নিজের Dispensary না থাকিলে Practice চলিবে না। আর তা ছাড়া ডিগ্রিহোল্ডার ছাড়া এখানে সুবিধা হওয়া শক্ত; তবে যতদিন না কিছু সুবিধা হয় ততদিন আমার বাসায় থাকুন বা যদি ইচ্ছা করেন তো Passage জোগাড় করিয়া দিই কলিকাতায় যান। কলিকাতায় আমায় টানিয়া আনিবার মত আকর্ষণ কিছুই ছিল না; তথাপি ডাক্তারের গলগ্রহও হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কি যে করিব তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ডাক্তারবাবু আমার সঙ্কোচের কারণ বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য বলিলেন "দেখুন শেখরবাবু আমাকে আপনার বড় ভাই মনে করিবেন, এই বিদেশে বাঙ্গালী হইয়া আমি বাঙ্গালীকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিব না।" আমার

হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইল, চক্ষে জল আসিল; আমি আর দ্বিধা করিতে না পারিয়া বলিলাম "দাদা! আমি জীবনে আপনার দয়া ভুলিব না, তবে যাতে নিজের মত উপার্জ্জন করিতে পারি সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।" ডাক্তারবাবু বলিলেন "শেখর আগুন কখন ছাই চাপা থাকে না—তবে এখন অন্ততঃ মাস খানেক থেকে শরীরটা শোধরাও, তারপর সে সব কথা হবে।" আমিও সেইদিন থেকে তাঁহার বাসায় আশ্রয় লাভ করিলাম—সেবা ও যত্ন জীবনে এর পূর্ব্বে কখনো পাই নাই—এক্ষণে সে দুটীর মাধুর্য্য উপভোগ করিলাম—সকালে প্রত্যহ তাঁহার সহিত হাঁসপাতাল যাইতাম আবার কার্য্যশেষে তাঁহার সহিত বাসায় ফিরিতাম, অপরাহ্ণে সহরের চতুর্দ্দিক বেড়াইয়া বেড়াইতাম, এইরূপে প্রায় ১ মাস অতীত হইয়া গেল, শরীরও অনেকটা শোধরাইয়া গেল গায়ে আবার বল পাইলাম—তবে আগেকার সে আনন্দটুকু আর ফিরাইয়া পাইলাম না। সুস্থ সবল উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও যে আমাকে অদৃষ্টচক্রে পর-নির্ভর হইয়া থাকিতে হইয়াছিল এ দুশ্চিন্তার গুরুভার আমাকে দিন দিন যেন অবসন্ন করিয়া দিতেছিল।

সেদিন সকালে ডাক্তার বাবুর অল্প অল্প জ্বর হইয়াছিল, হাঁসপাতালে যাইতে যাইতে পথে বলিলেন "শেখর আজ একটা বড় শক্ত অপারেশন আছে—শরীরটা ভাল নেই; কি যে করি; অথচ আজ Operation না হইলেই নয়" আমি বলিলাম "বেশ ত আপনি দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিবেন, আমি Operation করিব—আমি Operation কিছু কিছু জানি" "বেশতো তা যদি পারতো বড় ভাল হয়—কারণ Civil Surgeon

এখানে নেই, অথচ Caseটা তাঁর অপেক্ষায়ও রাখা নিরাপদ নয়—আর আজ আমার হাতের খুব ঠিক্ নেই।"

Operation করিতে গিয়া দেখিলাম Caseটা খুবই serious—যাইহোক ভগবানের নাম করিয়া ছুরি ধরিলাম—ডাক্তারবাবু আমার সামনেই দাঁড়াইয়া ছিলেন—শেষ করিয়া Bandage বাঁধিয়া যখন হাত ধুইয়া আসিলাম—তখন তিনি সানন্দে আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "Successful Operation—ধন্য তোমার শিক্ষা। শেখরনাথ আশীর্ব্বাদ করি ছুরি ধরা তোমার সার্থক হউক। সত্যি ভাই এ Operation আমি নিজে পারিতাম না—হয় ত হতভাগ্যের প্রাণটা নষ্ট হইত।" আমি আনন্দে তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমার অপারেশনের কথাটা এর মুখ ওর মুখ থেকে বড় সাহেবের (Civil Surgeon) কাণে উঠিয়াছিল তিনি একদিন ডাক্তার বাবুকে দিয়া আমায় ডাকাইলেন, আমি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন "বোস্, তোমার অপারেশন দেখে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি; এ্যানাটমীতে খুব উচ্চ জ্ঞান না থাক্লে এ Operation করা সম্ভব নয়—তোমার শিক্ষা খুব উৎকৃষ্ট, যদিও তুমি পাশ কর্ব্বার সুযোগ পাও নাই; তথাপি তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ইচ্ছাকল্লে আমি তোমায়

ভাল গভর্ণমেণ্ট-চাকরী দেওয়াইতে পারি।" ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন "সে আপনার অনুগ্রহ।" বড় সাহেব বলিলেন" তাতে কিন্তু তোমার প্রতিভার সম্যক সমাদর হবে না—তাই আমি তোমায় এমন একটা কাজে দিতে চাই যাতে পৃথিবীতে একটা অক্ষয় নাম রেখে যেতে পার। অথচ সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জন হইবে—কি বল রাজী আছ?", আমি বলিলাম "কাজটা কি বলিলে বলিতে পারি।" "সেটা ঠিক আমি জানিনা—আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু তোমার মতন একজন উৎসাহী অথচ চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সহকারী চান্" ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন "কে ডাক্তার শঙ্কর লাল নাকি?" "ঠিক তাই—আজ তাঁর আসবার কথা আছে সন্ধ্যার পর তোমরা দুজনে আমার ওখানে আসিও, সেখানে সব কথাবার্ত্তা হইবে।" আমরা তাঁহার কর মর্দ্দন করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদা ডাক্তার শঙ্করলালটী কে? ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন "সে এক অদ্ভুত লোক, লোকটা যেমন পণ্ডিত তেমনি ক্ষমতাবান্। সে যা বলে তার সিকিও যদি সত্য হয়, তবে সত্যই সে একটা অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে—তার সঙ্গে যদি জোটে তো তোমার সত্যই ভাল হবে—তবে আমার বোধ হয় তার মাথার একটু দোষ আছে" "কি রকম?" "সে বলে কি জান, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৃদ্ধ মরণোন্মুখকে ও নবীন যৌবন আর সহস্র বর্ষ পরমায়ু দান করিতে পারা যায় এবং সেইটা সম্পন্ন করিবার জন্য সে প্রাণপণ করিতেছে" আমার হাসি পাইল—বলিলাম "তা হলে একটী বদ্ধ পাগলের সঙ্গে জুটীয়ে দেবেন বলুন—তা আমিতে মরাকেও বাঁচাতে জানিনা আর আমার যা বিদ্যা তাতে বুড়কে

যুব, কর্ত্তেও পারব না—" "না অতটা ঠিক সম্ভব হবে না, তবে সে যেরকম বলে, তাতে কথাটা সত্যই হেসে ওড়াবার মতও নয়—কারণ সে লোকটা একটা খুব বড় দরের বৈজ্ঞানিক। চিকিৎসা-শাস্ত্র আর রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; ইংরাজীর কথা ছেড়ে দাও, সংস্কৃত ফ্রেঞ্চ জার্ম্মাণ ল্যাটীন গ্রীক উর্দ্দু প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় তার অসাধারণ দখল; ঐ সব দেশের চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্রও তাঁর ভাল রকম জানা আছে; অন্যান্য সভ্যদেশের মেডিকেল অথরিটিরা তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন।" আমার উপহাস ক্রমশঃ বিস্ময়ে এবং অবশেষে কৌতূহলে পরিণত হইল, আমি বলিলাম "তিনি কি হিন্দুস্থানী" "না না না—নামটা শুনলে ওরকম শোনায় বটে, আসলে কিন্তু তিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং খুব ধনীসন্তান; আজীবন এই সব নিয়েই ব্যস্ত আছেন—ঠিক পুরোদস্তুর সাধনা যাকে বলে—তা না হলে আমাদের সাহেব কি তার অত গোঁড়া—" "বটে তাহলে তো মানুষটাকে দেখ্‌তেই হচ্ছে—" "হ্যাঁ দেখবার মত মানুষ যে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এত পণ্ডিত—কিন্তু আবার যোগ শাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র মন্ত্র এ সবেও দক্ষ; জ্যোতিষ শাস্ত্র থেকে মায় রোজাদের ঝাড়ফুঁক পর্য্যন্ত সবই লোকটার জানা আছে—এ রকম লোক সচারচার দেখা যায় না—" "তিনি কি বরাবর এখানেই থাকেন?" "না না না সে এক প্রচণ্ড ভবঘুরে, আজ হেথা, কাল সেথা এমনি করে বেড়ায়। ভারতবর্ষের সব সহরেই নিজের বাড়ীও ল্যাবরেটারী আছে, আর পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাই ঘুরে এসেছে। এবার বোধ হয় ৪ বৎসর পরে রেঙ্গুনে এসেছে—কি মতলবে এসেছে সেই জানে" "আপনার কথা শুনে লোকটির উপর বড় শ্রদ্ধা হচ্ছে এবং তার সঙ্গে

যোগদান কর্ত্তে সত্যই আগ্রহ হচ্ছে—আপনার কোন অমত নেই তো? আমার নিজের বল্‌তে আর কেউ নেই—জীবনে স্নেহ যত্ন এক আপনি কচ্ছেন, আপনি ছাড়া আমার বলতে পারি এমন আর কেউ নেই; আপনার মত না নিয়ে—" আমার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল, ডাক্তার বাবু বলিলেন "শেখর তোমাকেও ভাই ভিন্ন আর কিছু ভাব্‌তে পারি না—তোমার যেমন জ্ঞান যেমন শিক্ষা যেমন উৎসাহ তা'তে শঙ্কর লালের সঙ্গে মিশ্‌লে তোমার ভালই হবে, তবে যেখানেই থাক আর যত বড়ই হও তোমার গরীব দাদাকে ভুলোনা—" "কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনার ঋণ বাড়বে বই কম্‌বে না, আমি যাই করি দাদা, আপনার মতন দাদার স্নেহ যেন জন্ম-জন্মান্তরেও পাই।" আমরা ততক্ষণে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পরেই আমরা সিভিল সার্জ্জনের কুঠিতে পৌঁছিলাম কুঠী সহরের একপ্রান্তে ইংরেজ মহল্লার শেষের দিকে অবস্থিত। চারিদিক বেশ ফাঁকা, বাড়ীটি বাংলা ধরণের। চারিপাশে ফুলের বাগান, ঢোকবার গেটটীতে লতান গাছ জড়িয়ে জড়িয়ে রক্তপুষ্প ও হরিৎপত্রে একটী স্নিগ্ধ শোভা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; গেট হইতে কুঠীর সিঁড়ি পর্য্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা দুধারে ছোট ছোট বিলাতি ফুলের গাছ—Daisy

Pancy প্রভৃতি। ডাক্তার সাহেবের মেম বিলাত গিয়াছেন সুতরাং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত একাই থাকেন—আমরা গিয়া দেখিলাম তিনি একখান Easy chair এ আড় হয়ে Medical Herald পড়ছেন, আমাদের দেখে হেসে বললেন, Good evening Mukerji, Good-eving Bose। বেহারা বসবার চেয়ার এনে দিলে আমরা বসলুম। সাহেব হেসে বল্লেন, "ডাক্তার একটু চা খাবে—না জাত যাবে?" দাদা বলিলেন "যারা দিনরাত মড়া ঘাঁটে তাদের জাত নেই" সাহেব তবু বলিলেন "ভাল তোমাদের প্রেজুডীস্‌টা অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে" দেখছি—'সাহেবের মগ cook (ঠাকুর বলিব কি?) আমাদের দু'বাটী চা বিস্কুট টোষ্ট রুটী মাখম চিনি প্রভৃতি এনে দিলে—আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সুরু করিলাম—সাহেব চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন "বুজরুকদের জন্য এবার আমাদের অন্ন মাটী হবে ডাক্তার —এ মাসের Medical Herald এ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা বেরিয়েছে পড়েছ—" "না—এবার কাগজ আসতেই আপনার কুঠীতে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার আর পড়া হয় নাই।" "ব্যাপারটা শোন—বিটলদাসের নাম শুনেছ, বোম্বের বিখ্যাত ক্রোরপতি—দুবচ্ছর আগে বম্বায় এসেছিল মনে পড়ে—" "ওঃ সেই যার বাম অঙ্গটা সব প্যারালিসিস হয়ে গিছল সেই বিটলদাস"। "হুঁ প্যারালিসিস এখানেই হয়, আমি তিনমাস চিকিৎসা করে কিছুই কর্ত্তে পারিনি—তারপর কলিকাতায় নিয়ে যায়, সেখানে ক্রাউনসাহেব ছমাস চিকিৎসা করে, নিস্ফল হয়ে বোম্বাই ফিরে যায়"। আমারও ঘটনাটা মনে পড়িল, ক্রাউনসাহেব আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল—তিনিই বিটলদাসকে চিকিৎসা করেন, এবং যখন বিটল

দাসের বাড়ী যেতেন, প্রায়ই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন—আমি বললুম হ্যাঁ ক্রাউন সাহেবের সঙ্গে আমিও তাঁকে অনেকদিন দেখতে গেছি" সাহেব বললেন এখন যদি কেউ বলে সেই বিটলদাস তারপর আরও দেড়বৎসর প্যারালিসিসে ভুগে এখন নির্দ্দোষ আরাম হয়ে, ছোকরার মতন কাজকর্ম্ম কচ্ছে। তাহলে সেটা খুবই কি আশ্চর্য্য—" সাহেবের কথা শেষ হতে না হতেই কে একজন গম্ভীর কণ্ঠে ইংরাজীতে বল্‌লো "আশ্চর্য্য পৃথিবীতে কিছুই নেই মিঃ ষ্টীফেন" আমরা তিনজনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্তেই বিস্ময়ের মেঘ অপসৃত হইল—আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে সাহেব বলিল "আসুন, আসুন ডাঃ শঙ্কর লাল আমরা তিনজনেই আপনার জন্য অপেক্ষা কচ্চি" "এঁরই নাম ডাঃ শেখর কুমার না" বলিয়া আমার দিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শঙ্করলাল একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন। "আপনি পূর্ব্বে ষ্টীমারের ডাক্তার ছিলেন না" বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ" বড় সাহেব বলিলেন "আপনি কি করে জানলেন যে ইনি পূর্ব্বে ষ্টীমারের ডাক্তার ছিলেন" "চোখে দেখে" দাদা বলিলেন "সেটা তো তাঁর মুখে লেখা নেই" "আছে বৈকি ভাল করে দেখলেই জানা যায়, এর জন্য আর এষ্ট্রনমী জানতে হয় না; ঐ দেখুন ওঁর কোটের বোতাম কটা ঐ কটাই ওঁর ষ্টীমার কোম্পানীর দাসত্বের সাক্ষ্য" আমি চাহিয়া দেখিলাম সত্যই সে কাটা ষ্টীমার কোম্পানীর Uniformএর বোতাম। লোকটার তীক্ষ্ম দৃষ্টি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। তারপর বললেন "মাস ছয় সাত আগে পোষ্টমর্টেম কর্ত্তে কর্ত্তে আঙ্গুল কেটে গেলে ব্লডপয়জনিং হয়ে ছিল না?"

আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া ঘাড় নীচু করে বললেম "আজ্ঞে হ্যাঁ" সাহেব বল্লেন "এটা তো ষ্টীমার কোংর বোতাম নয়, এটা তোমার হিন্দু এষ্ট্রলজী" "না না মিঃ ষ্টীফেন, এটাও শাদা চোখের হিসাব—ঐ দেখ ডানহাতের দ্বিতীয় আঙ্গুলে এখনো অপারেশনের দাগটা রয়েছে—আর তোমার পক্স হবারও কারণ তাই জেনো—যে রোগীটাকে Operation কচ্ছিলে সে লোকটা অন্য কোন কারণে মরলেও তার শরীরে বসন্তের বিষ ঢুকে ছিল, সে তখন না মলেও মাস পাঁচ ছয় পরে ঠিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মর্ত্ত। সেই বিষ এতদিন তোমার শরীরে প্রচ্ছন্ন ছিল কিন্তু তোমার শরীর খুব সবল ও সুস্থ বলে কিছু কর্ত্তে পারেনি কিন্তু যেই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটার দরুণ তোমার শরীরে Sea-Sickness ঢুকে তোমায় কাহিল কল্লে অম্নি তোমায় সে জব্দ করে পীড়িত কল্লে।" সাহেব হাসিয়া বল্লেন "ডাঃ শঙ্কর লাল, তুমি একজন হিন্দুযোগী"। "সে পুণ্য কি আর করেছি সাহেব, তাঁদের জ্ঞানের কণামাত্র পেলে কি তোমাদের Science পড়তে যেতুম! তা যাক্, এতো গেল বাজে কথা তোমরা যে Humbugর কথা বলাবলি কচ্ছিলে না, সে বুজরুক হচ্ছি আমি—

"আপনি—আপনিই বিটলদাসকে বাঁচিয়েছেন—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য।"

"আশ্চর্য্য কেন সাহেব, রোগ যেখানে উৎপত্তি, সেইখানেই, নিবৃত্তি; এতো আর তোমাদের অবিদিত নেই—রোগের কারণ ধরতে পারলেই রোগ আরাম হবেই—আর যতক্ষণ সেটা না ধরে কেবল লক্ষণ দেখে ঔষধ দেবে, ততক্ষণ আন্দাজে ঢিল ফেলা হবে; কোনটা আরাম হবে কোনটা হবেনা। এই হোমিওপ্যাথীর দেখতে পাওনা এক একটা কেস

এম্নি সেরে যায় যে লোকে মনে করে—একি! আবার অনেক ঘটনায় পঞ্চাশটা ঔষধ খাওয়ালেও কিছু হয় না—তাই হোমিওপ্যাথীতে কারও খুব পসার হয়, আবার কারু অন্নও হয় না—" "হোমিওপ্যাথী পড়েছ নাকি" "পড়তে হয়েছে বৈকি, সেও তো একটা সায়ান্স যদিচ তোমরা মাননা—যেমন আয়ুর্ব্বেদ--তোমরা তো গ্রাহ্যও করনা, অথচ যারা এটা সৃষ্টি করেছিল তারা তোমাদের চেয়ে বোকা লোক ছিল না ডাক্তার; এক একটা লোক জীবনব্যপী অনুসন্ধান, অনুশীলন করে যা রেখে গেছেন তাঁদের বংশধর হয়ে আমরা তার উন্নতি তো করিইনি, বরং তার যথেষ্ট অবনতিই করেছি; আর তারপরে এখন তাদের ঔষধকেই "অট্টালিকা চূর্ণ" প্রভৃতি বলে হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার একশেষ দেখাই—কেননা আমরা ইংরেজি শিখেছি; তোমাদের মন যুগিয়ে চলতে হবে তাই।" "সেটা ঠিক বলেছেন, আয়ুর্ব্বেদের দু একটা ঔষধ আমরা ব্যবহার করে দেখেছি - যেমন মকরধ্বজ—খুব ফল পাওয়া গিয়েছে!" "মকরধ্বজ—কি কর্ত্তে কর্ত্তে বেরিয়েছিল জানেন? ঋষিরা অজর অমর হবার অর্থাৎ জীবনীশক্তির অনুসন্ধান কর্ত্তে কর্ত্তে ওটা তৈরি হয়। আমাদের দেশে যদি মানুষ থাকতো তো ঐ জিনিষটা ধরে হয়তো এতদিনে অমর হবার উপায় বার করে ফেলতো। তা না হয়ে আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদের বিজ্ঞান প্রচার কর্ত্তে, তোমাদের বিজ্ঞান ভাণ্ডারে নূতন রত্ন আহরণ করে দিতে। তোমাদের ঔষধ বেচ্‌তে, তোমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের ধনী কর্ত্তে—" "সেটা কি আমাদের দোষ ডাক্তার" "না—না—না সে কথা যে বলে সে মূর্খ—আমাদের রত্নের মর্য্যাদা যদি আমরা না বুঝে তাকে যত্ন

না করি তো তোমরা কি কর্ব্বে—বরং তোমাদের ধন্যবাদ যে তোমরা নিজেদের বিজ্ঞান এদেশে প্রচার কর্চ্ছো ; নইলে যা হারিয়েছি তাতো গেছেই, তার উপর দেশের লোকগুলির কোন প্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা পর্য্যন্ত থাক্‌তো না—এখন তবু একটা চর্চ্চা হচ্ছে—সত্যিই আমার দেশের লোকের জন্য আমার বড় দুঃখ হয় ; সত্যই তারা বড় হতভাগ্য !”

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শঙ্কর লাল স্তব্ধ হইলেন ; বোধ হইল যেন একটা গভীর দুঃখে অবসন্ন হয়ে পড়্‌লেন—এই দীর্ঘবাহু সবল সুস্থ শ্মশ্রুগুম্ফহীন প্রৌঢ়ের ভিতর যে এত তেজ, এত জ্ঞান এত দেশ-ভক্তি ছিল তা হঠাৎ দেখে ধরবার যো ছিল না—ভক্তিতে গৌরবে হৃদয় আমার উদ্বেলিত হয়ে উঠল, আমি তাঁকে প্রণাম কল্লুম – মুখে কিছু বল্‌তে পারলুম না।” “দীর্ঘজীবী হও, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর” বলে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

খানিকক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম, কারণ যে কথাগুলি সকলে শুনিলাম, সেগুলি ভেবে দেখবার একটু সময়ের দরকার হয়েছিল। প্রায় দশ মিনিট সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে ছিলুম—তারপর প্রথমে ডাক্তার শঙ্করলালই সেই সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা ভেদ করে বললেন “কথায় কথায় আসল কথটাই বলা হলনা, ছিটকে পড়ে অনেক

দূরে চলে এসেছি ; আমি এমনি ইমোশন্যাল (ভাব প্রবণ) ! হ্যাঁ, তার-পর এই বিটলদাসকে আমিই আরাম করেছি, আর সেটা ঔষধ প্রয়োগ না করে কেবল তাকে হিপ্নটাইজ করে অর্থাৎ গোটাকতক প্যাস্ দিয়ে—রোজাদের ঝাড় ফুঁক করা বোধ হয় দেখেছ, এও অনেকটা সেই ধরণের; তবে আজকাল যারা রোজা হয় তারা পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে গোটা কতক অর্থহীন মন্তর শেখে ; কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষের যে হিপ্নটাইজ কর্ব্বার ক্ষমতা ছিল সেটা তাদের নেই—সাহেব তোমাদের এই হিপ্নটীজম্ আমাদের দেশে আগে অতি নিম্নস্তরের চিকিৎসা ছিল,—আমরা কালে কালে সবই হারিয়েছি ; কেবল পূর্ব্ব পুরুষের কৃতিত্বের শূন্য অহঙ্কার টুকু আঁকড়ে বসে আছি আর সবাইকে বলি দেখ আমরা কত বড় ছিলুম—কিন্তু এখন কি হয়েছি, সে ভাবনাটা খুব কম লোকেই ভাবে,—"অন্য কেউ হলে আমার একথাটা মোটেই বিশ্বাস হত না—কিন্তু ডাক্তার শঙ্করলাল তোমার মুখে এ কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হলুম" বলে বড় সাহেব দেশলাই জ্বেলে তাঁর মুখের চুরুটটা আবার ধরাইলেন, কারণ ভাবতে ভাবতে চুরুটটা নিবে গিয়েছিল। দাদা বল্লেন "এরকম প্যারালিসিস কেস হিপ্নটীক পাসে সারেন তা হলে তো ডাক্তারদের ক্রমশঃ তল্পী গুটুতে হবে" "তা কেন হবে ? এটাও তো ডাক্তারীর একটা অঙ্গ, তবে তোমরা স্বীকার না করিলে আর উপায় কি ? আমি দেখছি তোমাদের এখনও ভালরূপ বিশ্বাস হয়নি—না ? আচ্ছা হিপ্নটীজমের একটু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাচ্ছি বলে তিনি সামনে একটা খালি চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে বললেন "দেশলাইটা দাওতো" বড় সাহেব হাসিয়া দেশলাইটা এগিয়ে দিয়া বল্লেন, "এবার কি ম্যাজিক নাকি—এতক্ষণ তো সায়েন্স, হোমিও-

ধোঁয়ায় ক্রমশঃ বারান্দা ভরে গেল ১৭ পৃঃ

ব্যাধি আয়ুর্ব্বেদও হিপ্নটীজম হলো "দেখইনা" বলে পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বার করে, তাই থেকে ছাইএর মত খানিকটা গুঁড়া সেই পেয়ালায় ঢেলে, তাতে একটা দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন ; সেটা না জলে ধূঁয়া হতে লাগল—ধূঁয়ায় ক্রমশঃ বারান্দা ভরে গেল, তারপর ক্রমশঃ সেই ধূঁয়া মেঘের মত থাকে থাকে ভেসে ভেসে যেন আকাশের সঙ্গে মিশ্‌তে লাগল—আমাদের সকলে বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি এখন সেই ভাসমান মেঘরাশিতে আবদ্ধ হয়ে গেল—ক্রমশঃ সেই মেঘ ভেদ করে জ্যোৎস্নার মত মৃদু মৃদু আলোক এসে একটা বিরাট চন্দ্রমণ্ডলের মত আলোক-মণ্ডল সৃষ্টি করলে ; আর সেই আলোকের মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম একটা বৃহৎ অট্টালিকা—তার একটা সুসজ্জিত কক্ষে বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ ধনী বিটলদাস সুস্থ শরীরে বসিয়া আর তার সামনে বসে স্মিত-হাস্যানন ডাঃ শঙ্করলাল—বিটলদাস একটা চেক্ লিখে যেন শঙ্করলালের হাতে দিলেন—সেটা নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন ; ক্রমশঃ আলোকমণ্ডল নিষ্প্রভ হয়ে মেঘে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল, পরে মেঘও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম বারান্দায় ধূঁয়া ভরা আর ডাক্তার শঙ্কর চা'র পেয়ালার সেই গুঁড়াটাকে একটা কাটী দিয়া নাড়িতেছেন—একটা ডিস তাহার উপর চাপা দিতে ধূঁয়া বন্ধ হইয়া গেল—আমরা হাপ্ ছাড়িয়া চোক্ রগড়াইতে লাগিলাম। ডাঃ শঙ্করলাল বলিলেন "দেখ্‌লে, এবার বিশ্বাস হল" সাহেব বলিলেন "এটা খাঁটী আরব্য উপন্যাস" "তবে এই দেখ বলে তাঁর লম্বাকোটের পাশের পকেট্ থেকে একখানা ভাঁজ করা চেক্ বারকরে আমাদের সামনে ফেলেদিলেন। আমরা খুলে দেখিলাম "ডাঃ শঙ্কর লালের নামে

৫০ হাজার টাকার চেক্, আর তাতে বিটল দাসের সই" এর বিরুদ্ধে আর তর্ক চলিল না ; শঙ্করলাল সত্যই অদ্ভুত পুরুষ। যাক্ এইবার কাজের কথা বলি, বলে শঙ্করলাল আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন "শেখর বোধ হয় কতকটা টের পেয়েছ অসম্ভব বলে পৃথিবীতে কিছু নেই— ক্ষমতার যা বাইরে, লোকে তাকেই অসম্ভব বলে ; কিন্তু যদি উন্নতি করতে পারা যায় তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে—আগে ষ্টীমার বা ইঞ্জিন অসম্ভব ছিল এখন তা সম্ভব এমনি কি অতি মূর্খও সেটা কোনরকমে অসম্ভব বলে ভাবতে পারে না। যখন টেলিগ্রাফ টেলিফোন্ ওয়ারলেস, এরোপ্লেন সবই সম্ভব—তখন মানুষের নষ্ট যৌবন ফিরে আসা, সহস্র বর্ষ পরমায়ু হওয়া কিসে অসম্ভব?" বাস্তবিক লেকাটার কাছে বসে সেই রাত্রে তখন আমার মনে হচ্ছিল যে কিছুই অসম্ভব নাই। "এখন এই অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য আমি প্রাণপণ কর্চ্চি, যদি সম্ভব হয় তো জগতে ভারতের বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর স্থান সর্ব্বোচ্চ হবে, আর যদি হারি ক্ষতি কি? না হয় ধন—খুব বেশী প্রাণ, যেতে পারে তবুও আর একবার দেখতে হবে দুবার পেছুতে হয়েছে, কিন্তু এইবার আমার শেষ চেষ্টা। আমার এখন একজন নির্ভীক সহকারী চাই তোমাকে সেই জন্য ডাকিয়েছি— তুমি কি আমায় সাহায্য কর্ব্বে?" বলে তাঁর সেই আকর্ণবিস্তৃত উজ্জল তীক্ষ্ণ চোখ দুটী আমার চোখের উপর ফেল্‌লেন ; আমি সে তীব্র সম্মোহনদৃষ্টিতে যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম, বললুম "নিশ্চয়— আপনার জন্য আমারও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ; তবে আমার ক্ষমতা বড় অল্প" "এই তো বল্লুম ক্ষমতা কেউ নিয়ে আসে না, যে সাধনা

করে, ক্ষমতা তারই হাতধরা—আর একটা কথা তুমি প্র্যাকটিস্ করে যা উপায় কর্ব্বে তার চেয়ে কম তোমার পোষাবেনা। তবে আমি চাই আন্তরিক সাহায্য—মাহিনার চাকরের মত বাঁধাধরা রোজগণ্ডা-বাঁচান কাজ নয়—তোমার যৌবন আছে, উৎসাহ আছে শেখ্‌বার প্রবল ইচ্ছা আছে, তাই তোমায় নির্ব্বাচন করেছি; আচ্ছা আজ অনেক রাত হয়েছে এখন আসি; ঠিক কাল সকালে তুমি আমার চিঠি পাবে, তাতে কি কর্ত্তে হবে না হবে সব উপদেশ থাক্‌বে, সেইমত কাজ কর্ব্বে—কাল ভোরের জাহাজে আমি কলিকাতা যাইব "গুড্‌নাইট" বলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে টক্ টক্ করে নেবে গেলেন—আমাদের আপত্তি করবার বা একটা কথা বলিবারও অবকাশ দিলেন না—রাস্তায় বোধ হয় তাঁর মোটার ছিল ভোঁ ভোঁ করে আওয়াজ কর্ত্তে কর্ত্তে নক্ষত্রবেগে ছুটীয়া গেল। অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিলাম পরে মোহভঙ্গ হইলে সাহেব বলিলেন" "সত্যই অতি অদ্ভুত মানুষ!—কক্ষ্যচ্যুত উল্কার মত এসে পড়ে চারিদিকে অপূর্ব্ব-আলোক বিকীর্ণ করে আবার ক্ষণেকের মধ্যে সব অন্ধকার করে অন্তর্হিত হবে—শোন বোস্ আমার পরামর্শ, পারতো ওর সঙ্গে যোগদাও।" "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া দুজনে বাসায় ফিরিলাম দুজনেই এত উদভ্রান্ত হয়ে ছিলাম যে পথে একটা ও কথা কেহ কাহাকেও বলিতে পারিলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে দিন বাসায় ফিরে খেয়ে দেয়ে শুতে একটু বেশী রাত হয়ে গিছ্‌ল—আর ভোরের বেলা বেশ এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে ছিল বলে শেষের দিকটায় ঘুমটাও বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছিল—যখন চোখ চাইলুম তখন আটটা বেজে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে বস্‌তেই চাকর এসে এক বাটী গরম চা দিয়ে গেল, খেয়ে বেশ একটু তাজা হয়ে নিয়ে Rangoon-Times খানা পড়ছি, এমন সময় বেশ জাঁকাল উর্দ্দিপরা এক জন বর্ম্মা চাপরাসী এসে বললে, এই কি ডাক্তার মুখাৰ্জ্জীর বাড়ী, আমি কেবল ঘাড়টী নেড়ে স্বীকার করলুম। সে একখানা লম্বা চওড়া চিঠি বার করে বললে এ বাড়ীতে ডাঃ শেখর কুমার থাকেন কি? আমি কাগজ থেকে মাথা তুলে বললুম আমারই নাম শেখর কুমার বসু। সে একটা পিয়ন বহিতে সই নিয়ে চিঠি খানা দিয়ে চলে গেল। খামটা হাতে করে অনুভবে বুঝিলাম চিঠিখানা বেশ লম্বা চওড়া—এই সময়ে একান্ত অপরিচিত এই ক্ষুদ্র ডাক্তারটীকে কে এতবড় লম্বা চিঠি-লিখেছে ভাবতে, ভাবতে খুলে দেখি যে পত্র লেখক অন্য কেহ নহেন; গত রাত্রের পরিচিত ডাক্তার শঙ্করলাল। চিঠিটা টাইপকরা ইংরাজীতে লেখা—চিঠির সঙ্গে দেখি একখানা দশ হাজার টাকার চেক গাঁথা—তাই দেখে বিস্ময়ের মাত্রা খুবই বেড়ে গেল—চিঠিটা আগ্রহ সহকারে পড়ে ফেললুম, নিম্নে তাহার বাংলা তর্জ্জমা দিলুম—

"প্রিয় শেখর কুমার!

গত রাত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী অদ্য হইতে তোমায় আমি আমার

সহকারী রূপে নিযুক্ত করিলাম। কি কার্য্য করিতে হইবে ক্রমশঃ সমস্ত জানাইব, তবে কার্য্য খুব বিপদ সঙ্কুল ও কষ্ট সাধ্য। যদি ভরসা হয় তো অগ্রসর হইবে, নতুবা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে—তবে তুমি গতরাত্রে আমার কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছ, সুতরাং আমার ধারণা তুমি পরাঙ্মুখ হইবে না। উপস্থিত তোমার মাসিক বেতন ৫০০৲ শত টাকা ধার্য্য রহিল, সেই হিসাবে এক বৎসরের বেতন ৬০০০৲ টাকা ও এক বৎসরের জন্য অগ্রিম বোনাস্ ৪০০০ টাকা মোট ১০ হাজার টাকার চেক্ তোমার নামে ব্যাঙ্ক অফ্ বর্ম্মার উপর দিলাম।

এতদ্ব্যতীত তোমার আহার ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ আমি স্বতন্ত্র দিব, আশাকরি এ সকল বন্দোবস্ত তোমার মনোমত হইবে।

অদ্য রেঙ্গুন পোর্টে রাত্রি নয়টার সময় যাইবে, সেখানে একখানি ষ্টীমার তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে—ঐ ষ্টীমারে একটী রোগী আমার কলিকাতাস্থ মেটীয়াবুরুজের বাড়ীতে যাইবে; ষ্টীমারের জন্য টিকিট কিনিবার আবশ্যকতা নাই জানিবে। এই রোগীর যাত্রাকালীন দায়ীত্ব তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে ষ্টীমার ঘাটে আমার ভৃত্য তোমায় একটী ঔষধের বাক্স দিবে, ঐ বাক্সর মধ্যে একটী কাগজে ঔষধের ব্যবহার প্রণালী লিখিত আছে, তদ্দৃষ্টে যথাবিধি চিকিৎসা করিবে—রোগীটী বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ, সামান্য অসতর্কতায় তাহার প্রাণহানি ঘটিতে পারে, সুতরাং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আর একটী কথা, কোথায় যাইবে কেন যাইবে তাহা কাহাকেও বলিবে না। —এ সমস্ত গোপনীয় রাখার বিশেষ কারণ আছে॥ মেটিয়াবুরুজের বাড়ীতে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

নিরুপমা-পুরস্কার।

সাবধান—খুব সাবধান থাকিবে, কোন লোক যেন তোমার অনুসরণ করিতে না পারে—যদি সন্দেহ হয় কোন ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিতেছে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইবে বিশেষতঃ যদি অনুসরণকারী একজন একচক্ষুহীন চীনাম্যান্ হয় কারণ এই কাণা চীনাম্যান্ আমার ভয়ঙ্কর শত্রু; এবং সততই আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে যত্নবান্ আছে—ষ্টীমারে ছাড়িলেও এই সকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ভুলিবে না॥

শুভাকাঙ্ক্ষী

ডাঃ শঙ্কর লাল॥

পত্রপাঠে মন যুগপৎ আনন্দ ও আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া পড়িল—আমার বর্ত্তমান অবস্থায় দশহাজার টাকা যে রাজার ঐশ্বর্য্যের ন্যায় মূল্যবান তাহা বলা বাহুল্য; তবে এ কাজটা পূর্ব্ব যতটা সোজা ঠাওরাইয়াছিলাম, আজ আর ততটা সোজা মনে করিতে পারিলাম না—এতে যে সত্যই প্রাণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত আছে আজ সেটা উপলব্ধি করিয়া একটু ভীত হইলাম; আবার পরক্ষণেই সাহসে বুক বাঁধিয়া রওনা হইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম—দাদার ফিরিতে তখনও বিলম্ব ছিল। সহরে নিজ আবশ্যক মত ৩।৪ টা সুট একটা থার্ম্মমিটার এক-সেট্ অপারেশনের যন্ত্র হাইপডার্মিক সিরিঞ্জ ষ্টেথস্কোপ কতক গুলি দরকারী ঔষধ ও নিজের অবশ্যকীয় খুচরা জিনিস ও একটা বড় গোচের সুটকেস কিনিয়া আনিলাম্—চেক্ ভাঙ্গাবার দরুণ বাকী টাকা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে জমা দিয়া তাহাদের কলিকাতা অফিসে ট্রান্সফার করিবার জন্য বলিয়া আসিলাম—সঙ্গে সামান্য কিছু টাকা রাখিলাম।

যতদূর সম্ভব কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া সজলনেত্রে বিদায় লইলাম—প্রবাসে এই সহৃদয় বাঙ্গালী বন্ধুটী আমার যে কত উপকার করিয়াছিলেন তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না—এবং তাঁহার দয়া না পাইলে আজ আমাকে এত ঐশ্বর্য্য ও সম্মান ভোগ করিতে হইত না। বাসা হইতে বাহির হইয়া একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া পোর্টে যাইলাম—উপর হইতে দেখিলাম জেটি ফাঁকা তবে জেটীর কোলে একখানি ষ্টীমার আছে, দূর হইতে তাহার উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছে; বুঝিলাম ইহা সাধারণ যাত্রী ষ্টীমার নহে এই কার্য্যের জন্য বিশেষরূপে নিয়োজিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জেটীতে পদার্পন করিবামাত্র একটা থামের আড়াল থেকে খুব রোগা গোছের এক বর্ম্মীজ এসে আমার হাতে একটী ছোট বাক্স দিয়ে সেলাম করে চলে গেল, যেমন নিঃশব্দে প্রেতের মত বেরিয়ে এসেছিল, তেমনিই নীরবে যেন মিলাইয়া গেল—কোন কথাবার্ত্তা বা জিজ্ঞাসাবাদ কিছু না। জেটীর উপর প্রফুল্ল-জ্যোৎস্নালোকে একটী সুদর্শন মুসলমান যুবক পদচারণা করিতেছিলেন—আমি যাইবামাত্র ইংরাজী কায়দায় মাথার ফেজটুপীটি খুলিয়া বলিলেন "সেলাম ডাঃ বাবু—চট্‌করে উঠে পড়ুন, নটা বাজতে আর তিন মিনিট আছে, ঠিক নটায় আমার ষ্টীমার ছাড়তে হবে" আমি ষ্টীমারে উঠিয়া কুলীর মাথা হইতে সুটকেসটা

নামাইতে যাইতেছি—অমনি পিছন থেকে একজন খালাসী আসিয়া সেটা নামাইয়া লইয়া গেল ও কুলীকে পয়সা দিয়া বিদায় করিল। সেই প্রিয়দর্শন মুসলমান যুবকটী বলিলেন "এতে 'কিন্তু' হবেন না—ওসব আমাদেরই ভার—ডাঃ শঙ্করলালের এই রকম হুকুম" আমি যেন 'থ' মারিয়া গিয়াছিলাম—ডাক্তার শঙ্করলালের কাজের বন্দোবস্ত দেখিয়া সত্যই অবাক্ হইয়াছিলাম—বন্দোবস্তের বিশেষত্ব দেখিলাম—কথা কম কাজ বেশী। যাক্ জড়তা কাটাইয়া সেই মুসলমান যুবকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ জাহাজ কোন কোম্পানীর" "আজ্ঞে এটা বোম্বে-বর্ম্মা ষ্টীমসিপ কোংর জাহাজ নাম "বিচিত্রা" আমিই এর কাপ্তেন আমার নাম আগা মহম্মদ" বলিয়া তিনি একখানা চেয়ার টানিয়া দিয়া বলিলেন—একটু ডেকে বসিয়া হাওয়া খান আমি জাহাজ খুলিবার চেষ্টা করি—বলিয়া চলিয়া গেলেন। একটু পরেই একটা তীব্র বংশীধ্বনি শিহরিয়া শিহরিয়া চতুর্দ্দিক কাঁপাইতে লাগিল, পরক্ষণেই দেখিলাম পার্শ্বস্থ জলরাশি ধীরে ধীরে আলোড়িত হইতেছে বুঝিলাম জাহাজ চলিতেছে—জাহাজ হইতে সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল—ধীরে ধীরে জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি একাকী সেই জ্যোৎস্নালোকিত ডেকের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি যে মাথামুণ্ড ভাবিয়াছিলাম, আজ তাহা মনে নাই তবে বোধ হয় সেটা সংসারের অনিত্যতা এবং গৃহীত-কর্ম্মের অনির্দ্দিষ্টতা সম্বন্ধে। মাথার উপর দিয়া জলো হাওয়া বহিয়া যাইতেছিল মনে হচ্ছিল যেন আমার উস্কো খুস্কো চুলগুলার মধ্যে দিয়া কে শীতল-স্পর্শ অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে—একটু তন্দ্রার মত আসিল

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা—তন্দ্রা ভাঙ্গিল কাপ্তেনের কণ্ঠস্বরে; "চুরুট খান কি ডাক্তার বাবু" বলিয়া একটা চামড়ার সিগারকেস খুলিয়া আমার সামনে ধরিলেন। আমি "না" বলিয়া একটু নড়িয়া বসিয়া দেখিলাম আগা মহম্মদ আমার পার্শ্বের চেয়ারে উপবিষ্ট— "ভালকথা আমার রোগী কোথায়—তাঁকে একবার দেখা আবশ্যক তো?" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম "সেজন্য ব্যস্ত হবেন না—তাঁদের নীচের কেবিনে খুব Comfortably রেখেছি—এখনি দেখ্‌তে চান্" "হুঁ একবার দেখা আবশ্যক নয় কি?" "আবশ্যক তো বটেই তবে রোগীর যে অবস্থা তাতে বেশীক্ষণ যে দেখ্‌তে হবে তাতো বোধ হয় না" "তার মানে?" "তার মানে সেটী একটী আস্তমড়া; বোধ হয় এক তিল প্রাণ তাতে কোন রকমে আট্‌কান আছে—এই সমুদ্র যাত্রা যে সে সহ্য করে জীবিত অবস্থায় আবার ডাঙ্গায় ওঠে এমনতো বোধ হয় না" "তাঁর নার্স টার্স কেউ আছে" "হুঁ তা বেশ আছে সেই রোগীর এক নাত্‌নী আছে—সে খুব সেবা কর্ত্তে পারে, এই একঘণ্টা দেখে তা বুঝেছি—বাস্তবিক ডাক্তারবাবু আমি অনেক সময় ভাবি যে সেবা করা কাজটা যেন নারী-জাতির জন্যই সৃজিত হয়েছিল।" "তাতে আর সন্দেহ কি? হুঁ ভালকথা রোগীটী কোন জাতীয়" "তা আমি ঠিক জানিনা, তবে মেয়েটীকে হঠাৎ দেখলে বাঙ্গালীর মেয়ে বলে বোধ হয়, কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে বর্ম্মীজ বলে মনে হয় তবে রোগীটীকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নাই সে যেন সকল জাতির গণ্ডীর বাইরে—" "আপনি তা হলে তাঁদের বিশেষ চেনেন্ না—" "না—আর এরকম ঝক্কি ঘাড়ে নেওয়া, ঠিক নয় তবে কি জানেন এই ষ্টীমার কোম্পানীর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছেন আমার মামা, নুরুল হোসেন চৌধুরী তিনি ডাক্তার শঙ্কর লালের বিশেষ বন্ধু—আর শুধু বন্ধু কেন তাঁর কাছে এক রকম বিক্রীত বল্লেই হয়, তাঁর বিশেষ অনুরোধেই এই হাঙ্গাম পোহান—আপনার সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের কি রকম সম্পর্ক।" "সম্পর্ক হচ্ছে প্রভূ ভৃত্য, তবে তার সঙ্গে আরও একটা দৃঢ় বন্ধন আছে অনুরাগ—তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার আমি একজন নীরব উপাসক" "তাঁর ক্ষমতা যে সত্যই অলৌকিক তাতে আর কোন সন্দেহ নাই—আমার মামা হাঁপানীর ব্যায়রামে পনর বৎসর ভুগ্‌ছিলেন—তারপর ৪ বৎসর হল উনি চাটগায়ে কি একটা কাজে এসে ওঁর সঙ্গে আলাপ করেন, মাত্র দুই সপ্তাহের চিকিৎসায় একবারে সেরে যান্—এখন এমন চেহারা হয়েছে যে দেখ্‌লে কে বলবে এ লোক পনর বৎসর হাঁপানীর ব্যায়রামে ভুগেছিল—তবে এবার যে রোগী নিয়ে যাচ্ছেন এতে কি হয় বলা যায় না" এই সময় পাশে খট্ করে একটা আওয়াজ হোল চাহিয়া দেখি জাহাজের ক্যাপষ্টানের উপর বসে একজন চীনাম্যান—কাল ছাতার কাপড়ের মত চকচকে কাপড়ের কোর্ত্তাপরা, পিঠে একটা লম্বা বেণী এবং বামচক্ষু হীন—আমি কথা না কহিয়া সেদিকে ছুটিয়া গেলাম, যাইতে যাইতে সে ডেকের পাড় ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল—মুহূর্ত্ত মধ্যে আর তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই—কাপ্তেন সাহেব বলিলেন" কি ডাক্তারবাবু কি হল ওদিকে ছুটলেন কেন"—আমি ভীত কণ্ঠে বলিলাম "কিছু দেখলেন কি?" "কি ভূত নাকি?—আমাদের জাহাজে ভূত নাই। আমার বুকটা তখনও গুরু গুরু করিতেছিল—এই উপহাসটা তেমন সহজ ভাবে লইতে পারিলাম না একটু বিরক্ত ভাবে বলিলাম

"ভূতের আমার ভয় নেই—একটা কাণা চীনাম্যান বসে ছিল দেখেছেন কি" "চীনাম্যান—চীনাম্যান—আসুন দেখি খুঁজে বলিয়া তিনিও যেন শঙ্কিত হয়ে একটা হুইস্‌ল দিলেন—তৎক্ষণাৎ প্রথম মেট আসিয়া হাজির হইল; কাপ্তেন বলিলেন "ভাল করে জাহাজে খোঁজ কর কোন চীনাম্যান এতে আছে কিনা"—মেট আলোক ও লোকজন লইয়া জাহাজের খোলের মধ্যে নামিয়া গেল। তখন তিনি আমায় বলিলেন "এত সত্যই ভয়ের কথা, ডাক্তার শঙ্কর লালের আদেশ জাহাজে যেন কোন রকমে অন্য লোক না উঠে বিশেষতঃ একজন কাণা চীনাম্যান—সেইজন্য সমস্ত বাছাই লোক নিয়ে এ জাহাজে আমি নিজে যাচ্ছি—আমাদের লোকজন অবশ্য সকলেই চট্টগ্রামের মুসলমান—কেবল আপনাদের জন্য একটী হিন্দু ঠাকুর আছে আর আমি জাহাজ জেটীতে ভিড়ান থেকে ছাড়া পর্য্যন্তও সর্ব্বদাই নিজে নজর রেখেছি—সে উঠল কোথা দিয়ে—আপনার দেখবার ভুল হয় নাই তো—" "আমার তো ভুল হয়েছে বলে বোধ হয় না—কারণ তাকে আমি নেবে যেতেও দেখেছি—" বলিয়া যেখান দিয়া সে নামিয়া গিয়াছে সেখানে যাইয়া দেখিলাম পরিষ্কার ডেকের উপর একটী জ্যাবড়া কালো ছাপ ঠিক যেন একটী প্রকাণ্ড রোপ্‌সোল জুতার দাগ আর গুঁড়া গুঁড়া কয়লার দাগ। কাপ্তেন বলিলেন "না একজন লোক যে এখানে এসেছিল তাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং সে কয়লা ঘরের উপরে গিয়াছিল—তা নইলে এখানে এরকম কয়লার গুঁড়ার দাগ হতেই পারে না। কিন্তু এখান দিয়া নেমে সে যাবে কোথায়? রহস্য ক্রমশঃই গুরুতর হচ্ছে যে! "আমি বলিলাম ঠিক এর নীচে একটা পোটহোল রয়েছে ওর মধ্যে

দিয়ে ভিতরে যায় নাই তো!" "সন্দেহ রাখবার দরকার নাই চলুন আমরাও গিয়ে দেখি" দুজনে নীচে গিয়া দেখিলাম জাহাজের সমস্ত লোক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম কয়লা ঘর এনজিন-রুম চতুর্দ্দিক দেখি-লাম কোথাও কোন চিহ্ন নাই। ঐ জুতার দাগটী না থাকিলে আমার কথা এরা হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। অন্বেষণ যখন শেষ হইল তখন রাত্রি প্রায় ১২টা—আমি বলিলাম "কাপ্তেন সাহেব যখন নীচে এসেছি একবার রোগীটিকে দেখে যাই—তিনি সঙ্গে করে এনে একটী কেবিনের দরজায় আঘাত করিলেন—দ্বার মুক্ত হইল—মৃদু ইলেক্ট্রীকের আলোকে দেখিলাম মুক্ত দ্বার-দেশে দণ্ডায়মানা এক পরমাসুন্দরী যুবতী—পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই ব্রহ্মদেশীয়ার ন্যায় তিনি বেশ সহজ ভাবে একটী ছোট নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনিই কি ডাক্তারবাবু" আমি প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু আপনি বাংলা কথা শিখলেন কি করিয়া" "বাঙ্গালী—তা বুঝি আপনি জানেন না" বলিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন—সে হাসিটা তখন কত মধুর লাগিয়াছিল এ বৃদ্ধ বয়সে তাহা ঠিক অনুমান করিয়া বর্ণনা করিতে পারিব না কারণ তখন আমার নবীন যৌবন আশা আকাঙ্ক্ষার বাসনায় হৃদয় ভরা ছিল আর এখন পরিপূর্ণ বার্দ্ধক্য পরিতৃপ্ত জীবন—এখন সে ভাবা সে ভাব সে উপভোগ করিবার শক্তি নাই তাই বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম না। তবে তখন যেন লজ্জায় আমায় একটু জড়সড় করিয়া দিয়াছিল আমি সেই জন্য কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারি নাই—তাই তিনি আমাকে একটু সামলাইয়া লইবার অবকাশ দিয়া বলিলেন "আসুন ভেতর আসুন—দাদামশায়কে একবার দেখুন

বলিয়া নিজে সরিয়া গিয়া কেবিনের এককোণে বসিলেন আমি কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

কেবিনটী বেশ প্রকাণ্ড—জাহাজের মধ্যেই এই দুটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বেশ সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত একটী ছোট কৌচে একজন বৃদ্ধ শায়িত—সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত কেবলমাত্র মুখটী বাহিরে আছে মৃদু ইলেকট্রিকের আলোকে দেখিলাম মুখখানা নিঃরক্ত নিষ্প্রভ—ঠিক যেন মৃতেরমুখের ন্যায়; চক্ষু মুদ্রিত—রোগী যে অত্যন্ত স্থবির তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।—পার্শ্বে একখানা রাগ্ পাতা রহিয়াছে অনুমানে বুঝিলাম রমণী তাহাতে শুইয়া ছিলেন—আমি মেঝেয় বসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলাম এখন তো নাড়ীর গতি উপলব্ধি করিতে পারিলাম না—একবার সন্দেহ হইল রোগী মৃত নয় ত? অনেকক্ষণের পর বুঝিলাম নাড়ীর গতি আছে তবে অতি মৃদু। "কেমন দেখ্‌লেন।" বলিয়া সেই কিশোরী আমার মুখের উপর তাহার উজ্জ্বল আয়ত নয়ন দুটী স্থাপিত করিল—জীবনে প্রথম এইমাত্র নারীর সম্মুখে বসিয়াছি—সুতরাং মনের মধ্যে একটী সঙ্কোচ আসিয়া আমাকে কেবলই যেন 'কিন্তু' করিয়া দিতেছিল—আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—"দেখেই আমি খুব ভয় পেয়েছিলুম—তবে নাড়ী দেখে বুঝিলাম প্রাণ এখন ও ধুক্ ধুক্ কর্চ্চে।" "তা হলেই হোল—দিবারাত্রই উনি এভাবে

থাকেন এক আধবার চোখ চান্—আর কথা তো মোটেই বল্‌তে পারেন না—তবে আমি আন্দাজ অনেকটা বুঝে নিয়ে যা দরকার দিতে পারি—" এ অবস্থা কতদিন হয়েছে" "তা প্রায় ৪।৫ বছর হবে গোড়ায় এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েননি—তবে ক্রমশঃই—রোগ বিশেষ কিছু নেই—এটা খালি বয়স বেশী হওয়ার জন্য"—"এঁর বয়স এখন কত হবে?" "আন্দাজ করুন দেখি"—আমি প্রশ্ন শুনিয়া আর একবার রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া লইলাম—বয়স যে খুবই বেশী হইয়া গিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহই ছিল না—ভাবলুম ৭০।৭৫ হবে তা'র বেশী সাধারণতঃ আজকাল তো লোক বাঁচে না—বিশেষ বাঙ্গালী, বাঙ্গালাবাসী হইলে তো আর কথাই নাই; বলিলাম "কত আর হবে সত্তরই হোক—" হো হো করিয়া সালোয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল "আপনি তো তা হলে খুব ডাক্তার" আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "কেন?" সালোয়া বলিল "রোগীর নাড়ী দেখে বয়স বলতে পারলেন না, এঁর বয়স ঠিক পূরো একশো হয়েছে।" "বলেন কি একশো বছর—আজকাল লোকে একশ বছর বাঁচে কি?" "বাঁচে না তা জানি কিন্তু আমার আর কেউ নেই বলেই ভগবান বোধ হয় এখনও ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন"—কথাটা বলিবার সময় সালোয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল,—কথাগুলো ভারী ভারী বলিয়া যেন কাণে বাজিতে ছিল—তাই তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিলাম আপনার দাদাবাবুর নাম কি? "ওঁর নাম হচ্ছে দুর্গাদাস দত্ত আমি হচ্ছি ওর ছোট ছেলের মেয়ে—আমাদের আর কেউ যে নেই, তাই উনি আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন, এমন কি—" এই বলিয়া কিশোরী থামিল কি একটা

বলিতে গিয়া বোধ হয় মনে ভাবিল যে একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের তা হৌক না কেন সে ডাক্তার, সামনে নিজেদের ঘরের কথা অসাবধানে প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি একটু সাহস পাইয়াছিলাম—বলিলাম "থামলেন কেন বলুন না—আমায় লজ্জা করবেন না আমি ও বাঙ্গালী বিপদের সময় অন্ততঃ আমায় আপনার মনে করবেন—বিশেষতঃ আপনাদের ভার যখন আমার হাতে—কোন রকমে আপনাদের এক তিল কষ্ট বা অসুবিধা হলে আমার আপ্‌শোষ রাখিবার জায়গা থাকিবে না।" বালিকা চতুরা, সেও কথা ফিরাইতে জানে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "হাঁ তাতো বটেই বিশেষ ডাক্তার শঙ্করলাল, দাদাবাবুর বিশেষ বন্ধু তিনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা—তাঁর অনুরোধ আপনার কথামত চলা—সুতরাং আপনাকে তো পর ভাবিতে পারিই না" আমার মনটা এই কথাতে একটু ভারী হইল ; মনে ভাবিলাম ডাক্তার শঙ্করলালের অনুরোধই আমি আপনার লোক হইতে পারি নচেৎ নয়—যেন 'আমি' মানুষটার কোন দামই নেই ; পরক্ষণে ভাবিলাম সত্যই তো আমি এমন কি করিয়াছি যাহাতে এই দুই দণ্ডের আলাপে এতটা আত্মীয়তার দাবী করিতে পারি—সুতরাং আমার এ অভিমান সাজে না—এটা আত্মগরিমার চিহ্নমাত্র। আমি বলিলাম "এখন উঠি অনেক রাত হয়েছে আপনাকে আর বৃথা জাগাব না—আমি উপরেই আছি—কোন রকম আবশ্যক হলে আপনার দেওয়ালের ঐ বোতামটা টিপে দেবেন—আমার ঘরে বেল বেজে উঠ্‌বে আমি তৎক্ষণাৎ আসব"—"এরি মধ্যে উঠ্‌বেন—আচ্ছা আপনার ও তো বিশ্রামের প্রয়োজন আসুন তবে নমস্কার।"—আমি আর একবার রোগীকে

দেখিয়া—কেবিন হইতে বাহির হইয়া উপরে আসিলাম। উপরে আসিয়া দেখিলাম কাপ্তেন আগা মহম্মদ প্রকাণ্ড একটা বর্ম্মাচুরুট মুখে করিয়া ডেকের উপর একটা ইজিচেয়ারে পড়িয়া আছেন চারিদিকে চুরুটের গন্ধ ও ধোঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছে—আমায় দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "কেমন রোগী দেখিলেন বলুন।" যদিও কেবিনে গিয়া আমার একটু নিদ্রা দিবার অভিপ্রায় ছিল লজ্জায় খাতিরে বসিতে হইল—তাহার পাশে একটা চেয়ার টানিয়া বসিলাম—তিনি বলিলেন "কি বস্‌চেন যে ঘুমাবেন না? আমার তো অদৃষ্টে নিদ্রা নেই আপনি কেন মিছে রাত জাগচেন—বিশেষ ডাক্তার মানুষ—আমি বলিলাম "মানুষ তো—তা ডাক্তারই হই আর যাই হই—আপনিও যখন সারারাত জেগে বসে থাক্‌বেন তখন আমিও বসে একটু গল্পগাছা করে আপনার রাত্রিজাগরণের সাহায্য করি।"

দশম পরিচ্ছেদ।

জাহাজ তখন গভীর সমুদ্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে—আকাশ নির্ম্মেঘ—পরিষ্কার প্রফুল্ল জ্যোৎস্নালোক সমুদ্র তরঙ্গের শিখর কিরণময় মুকুট পরাইয়া দিতেছিল আবার জাহাজের গায়ে লাগিয়া যখন সেগুলি সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদকর শোভা সৃজন করিতেছিল তখন সেই সব দেখিয়া কত অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়িতেছিল—সৃষ্টির বিশালত্ব—মনুষ্যের ক্ষুদ্রত্ব—শূন্য অহঙ্কার—জয় পরাজয়—

সত্য মিথ্যা এই রকম কত অসংলগ্ন চিন্তা। দুজনেই পাশাপাশি বসে অথচ বেশী কথা হচ্ছিল না—হঠাৎ কাপ্তেন বলে উঠ্‌লেন—"এটা যেন একটা স্বপ্ন" আমি বিস্ময়ে বলিলাম "কোনটা?" "মানুষের জীবনটা—ও! আপনি—আর রাত করবেন না ডাক্তারবাবু শুন্‌গে" আমি বলিলাম "আজীবনটাইতো শুয়ে বসে গড়িয়ে কাট্‌ছে—বাস্তবিক এই সমুদ্রযাত্রাটা আমার খুব ভাল লাগছে—আপনাদের বেশ জীবন। কেমন দেশ বিদেশ দেখে বেড়ান—" "বাইরে থেকে তাই দেখায় বটে—কিন্তু এই পরিষ্কার আকাশ এই মুহূর্ত্তেই মেঘে আচ্ছন্ন হতে পারে—ঝড় উঠ্‌তে পারে—কত বিপদ্ আপদ্ আস্‌তে পারে—সেটা ভেবেছেন কি? একেবারে ষোল আনা সুখ বা ষোলা আনা দুঃখ কিছুতেই নেই—সুখ দুঃখ জড়িয়েই সব তা না হলে দুটোর উপলব্ধি হবে কেমন কোরে। তাইতো বলছিলেম মানুষের জীবনটা একটা স্বপ্ন।" "অন্ততঃ এই রকম অবস্থায় বসে তাই মনে হয় বটে—তবে স্বপ্ন ভাঙ্গতে কতক্ষণ?" "আপনার কেমন রোগী দেখলেন বল্লেন না তো—" "কি আর বোলবো—লোকটীর বয়েস হয়েছে অনেক তার উপর অবস্থাও খুব ভাল বল্‌তে পারি না—একে চিকিৎসা করে বাঁচাবার চেষ্টা তো পাগলামো বলেই বোধহয়—কি ভেবে যে ডাক্তার শঙ্করলাল এ ভার নিয়েছেন আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না—তবে মেয়েটীর অবশ্য আর কেউ নেই।" "সেটা তো ঐ বুড়োরই দোষ মশাই—ওকি আজকের বুড়ো আমি তো ছেলেবেলা থেকেই ওকে ঐরকম দেখ্‌ছি।" "আপনি তাহলে রেঙ্গুনের অধিবাসী বলুন" "হ্যাঁ আমার বাপ্ ছোটবেলায় এ দেশে কারবার কর্ত্তে আসেন—আমার

জন্মই রেঙ্গুনে"—"তাহলে আপনি ওঁদের বিশেষ চেনেন বলুন" "তা চিনি বৈকি? রেঙ্গুনে দুর্গাদাস দত্তকে না চেনে কে—উনি খুব বড় কারবারী ছিলেন তবে ওঁর ছোট ছেলেটী মারা যাবার পর করাবার বেচে ফেলেন—লোকটা অগাধ টাকার মালিক—বহুকাল পূর্ব্বে বাংলা ছেড়ে কারবার কর্ত্তে এখানে আসে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে শেষ জীবনটায় খুব রোজকার করেছিল—তবে ঐ যা বল্লুম একটানা সুখ তো ভোগ হবার যো নাই—তাই ভগবান একে একে পুত্র পত্নী যে যেখানে ছিল সব নিয়ে নিলেন—এখন বেঁচে থাক্‌বার মধ্যে ঐ মেয়েটী; উটী ওঁর ছোট ছেলের মেয়ে বুড়োর ভারী আদরের জিনিষ—তাই প্রাণধরে মেয়েটীর বে দেয়নি নইলে বাঙালীর ঘরে ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে কি আইবড় থাকে—কিন্তু নিজেকেও যে একদিন যেতে হবে সেটা বুড়ো ভাবেনি—এখন মেয়েটীর অবস্থা কি রকম হবে বলুন তো?" "সত্যই তো বরং বে দিয়ে দিলে ওঁরও আজ একটা সহায় হোতো—" "ঠিক্ এ কথা সহরের সবাই বোল্‌তো কিন্তু বুড়োর ধারণা ছিল সে শিগ্‌গির মরবে না—আর সেটা নেহাৎ মিথ্যেও নয়—নইলে আজকালের দিনে একশত বৎসর বাঁচা—একেবারে অসম্ভব—আর ওঁর একমাত্র বন্ধু ঐ ডাক্তার শঙ্করলাল—অত বড় বিষয়ের একমাত্র ট্রাষ্টী—তবে এযাত্রা যে তাঁকে বাঁচাতে পারেন তা আমার বোধহয় না—তা তাঁর যতই ক্ষমতা থাক্ না—খোদার উপর তো খোদ্‌কারী চল্‌বে না। "এবার বোধহয় বা তাঁকে বদ্‌নাম কিনতে হয়—লোকটার ভরসা দেখলে বাস্তবিক গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।"—"ওঃ সমুদ্রের যে টানটা বড় বাড়ছে দেখছি—আমায় উঠতে হল" বলে আর একটা চুরুট ধরিয়ে কাপ্তেন উঠিয়া গেলেন—

আমিও নিঃশব্দে কেবিনে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম কিন্তু আসিল না—একটু আগে যে ঘুম চোখের পাতায় জড়াইয়া ধরিতেছিল সে কিসের বৈদ্যুতিক স্পর্শে আহত হইয়া যেন কোথায় পালাইয়া গেল বক্ষে পড়িয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম—কত কি ভাবিয়াছিলাম—তাহার আজ ঠিক হিসাব দিতে পারিব না তবে যে সেটা এই শতবর্ষীয় বৃদ্ধ ও তাঁহার ষোড়শী পৌত্রীর সম্বন্ধে তাতে আর ভুল ছিল না—কেবিনের সেই দারুণ অন্ধকারেও যেন দুটী উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু আমার মানস নয়নে প্রতিভাত হইতেছিল—কি দীপ্ত মধুর সরল চাহনী—ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই চোখ দুটীই যেন চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল হরি! হরি! একি হইল—আমি কি বিহ্বল হইলাম—এরকম তো জীবনে কখন হয় নাই—তবে কি মজিলাম! কি সর্ব্বনাশ—কোথাকার কে তার ঠিক নাই—তার চোখ দুটী কেন আমায় এমন করিয়া উত্যক্ত করিতে লাগিল—কতক্ষণ এরকম ভাবিতে ভাবিতে যে শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা স্মরণ নাই—তবে তখন রাত্রি আর খুব বেশী ছিল না—নিম্নে জলধির গুরু গম্ভীর গর্জ্জন একটা অস্ফুট আর্ত্ত ক্রন্দনের মত শুনা যাইতেছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কেবিনের দরজা ভেজান ছিল—তাহার ফাঁক দিয়া প্রখর সূর্য্যকিরণ আসিয়া আমার নিদ্রা-বিজড়িত চোখের উপর পড়িয়া আমায় জাগাইয়া তুলিল—উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি সেই

মেয়েটী ডেকের উপর বেড়াইতেছে—আমায় দেখিয়া সস্মিতমুখে বলিলেন "সুপ্রভাত—সুপ্রভাত—ডাক্তারবাবু খুব ভোরেই ওঠেন দেখ্‌ছি"—বেশ একটী সহজ সুন্দর পরিহাসের সুর সে কণ্ঠধ্বনিতে প্রতিভাত হইতেছিল। আমি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম "আপনার কি বলুন না বেশ গাঢ় নিদ্রা দিয়ে ভোরে উঠেছেন—কিন্তু আপনাদের ভাবনায় সারারাত কি ঘুমিয়েছি—এই ভোরেরবেলায়—"আমার কথা শেষ না হইতে দিয়া কিশোরী সহাস্যে কহিল "একটু গভীর তন্দ্রা এসেছিল! ঈস্ তাহলে দেখ্‌ছি আমাদের উপর আপনার খুব টান জন্মেছে—তা অত ভাবনা বাজে খরচ করবেন না ডাক্তারবাবু" প্রগল্‌ভা বালিকার এ পরিহাসের উত্তর দিবার মত ভাষা আমার অভিধানে ছিল না আমি বলিলাম "তাইতো আপনি তাহলে শুধু সকাল সকাল উঠেন নি—আবার স্নানও সেরেছেন দেখ্‌ছি—" "ভোরবেলা আমি চির-কালই স্নান কারি—মুখধুয়ে নিন আপনার জন্য এখুনি চা আনাচ্চি—চা খান্‌তো।" "পেলেই খাই তবে চেষ্টা করে খাওয়া আমার স্বভাব নয়—"

একলোটা জল ও একটী কেট্‌লী হাতে মিশির ঠাকুর দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মাইজি বাবুকা ভি পাকায়েঙ্গে তো—" "জরুর" বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ও আমাদের ঠাকুর আপনার জাত জাবে না—ভয় নাই—ভাল কথা ডাক্তারবাবু আপনার নামটী কি তাতো জানি না" "কেন ডাঃ শঙ্করলাল বলেন নি?—আমার নাম শ্রীশেখরকুমার বসু।" ডাঃ শঙ্করলালের নামটী উল্লেখ করিয়া কল্যকার খোঁচা খাওয়ার প্রতিশোধ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য

ছিল কিন্তু সেটা তিনি গায়ে মাখিলেন না—একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন "তাহলে আপনি আমাদের কায়স্থ—তবে আমাদের ছোঁয়া খেলে জাত যাবেনা—কি বলেন? "আমার জাত অত সহজে মরে না—কোন জাতই ছুঁয়ে দিয়ে আমার জাত কে মার্ত্তে পারে না" "তা হলে জাত আপনি মানেন না কেমন?—নিন্ চট্‌করে মুখধুয়ে নিন্ চা'টা জুড়িয়ে যাবে—" আমি মুখধুয়ে রুমালে মুখ মুছিয়া চেয়ারটা টেবিলের কাছে টানিয়া বসিলাম—তিনি সযত্নে এক বাটী চা ঢালিয়া আমায় দিলেন—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম "আপনি খাবেন না" "খাবো অখন" "ওঃ আমার সামনে খাবেন না—এই কথা আচ্ছা আমি উঠে কেবিনে গিয়ে থাচ্ছি—আপনি চা খান" "অত রাগ করা ঠিক নয় আপনি ডাক্তার লোক আপনাদের সর্ব্বদাই মাথা ঠাণ্ডা রাখা উচিত—আপনি কি জানেন না যে আমি বাঙালী—বাঙালীর মেয়েরা কি পুরুষের সামনে বসে খায়।" "কেন খাবে না শত সহস্র, আজকাল এতো চলে' গেছে" "তা যাক্ সব চালচলনই যে ভাল তার ঠিক কি—এতে নারীর মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়—আপনি খান আমি বরং বসে থাক্‌ছি।" আমি চা খাইতে খাইতে বলিলাম "দেখুন আপনাকে দেখে কাল খুব ছেলেমানুষ ঠাউরে ছিলুম কিন্তু আজ দেখ্‌চি—" "আমি একটা পাকা বুড়ী নয়?" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন—সে হাস্য যে কত নির্ম্মল কত সুন্দর কতটা শুভ্র সারল্য তাহাতে ঝলকিয়া উঠিতেছিল আজ তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ অসম্ভব।

"আপনি সকল কথাতে অত ঠাট্টা করেন কেন আমি বল্‌ছিলাম যে আপনি আপনার যা বয়স তারচেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী—যাক্ আপনার

দাদাবাবু আজ কেমন আছেন—ইন্দ্রজালের ন্যায় হাস্য পরিহাস আনন্দ চাঞ্চল্য কোথায় অন্তর্হিত হইল—মুখখানি চিন্তা ছায়াচ্ছন্ন করিয়া বলিল "সেই রকমই এখনও ঘুমুচেন—সকালটা বেশ স্থির হয়ে ঘুমান বেলা বাড়লে বোধহয় একটু যন্ত্রণা বাড়ে যেন অশ্বস্তি অনুভব করেন—যাক্ আপনি স্নান করে নীচে আসুন একটু জলখেয়ে নেবেন আর অমনি একবার দেখে আস্‌বেন, অনেক বেহায়াপণা করে গেলুম কিছু মনে করবেন না নমস্কার" বলিয়া আমাকে আর কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একা বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না—এমন উজ্জল প্রভাত এমন নাতি শীতোষ্ণ সমুদ্র বায়ু—এমন প্রখরোজ্জল সূর্য্যকিরণ—আকাশ ও সমুদ্র যেন আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—এহেন সুন্দর প্রভাতে একাকী বিমূঢ়ের ন্যায় থাকা অসম্ভব—এমন সময় দুটা কথা কহিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয় কাপ্তেন সাহেবের অনুসন্ধান করিলাম—বেচারা সারা-রাত জাগিয়া নিশি শেষে সারংএর হাতে চার্জ্জ দিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে গল্পের খাতিরে তাঁকে জাগাইয়া তুলি এত বড় স্বার্থপর আমি নহি। কি করি একা তাই ভাবিতেছি—এমন সময় মিশিরজী আসিয়া বলি-লেন "বাবুজী আস্নান্ কর লিজিয়ে—বেলা হোনেসে বহুৎ তক্‌লিফ হোগা"—কাজেই কেবিন বন্ধ করিয়া স্নানের ঘরে যাইলাম—একজন

খালাসী তুই বালতী মিঠা পানি—লেমলেড মনে করিবেন না—সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া স্নানে ও পানের জন্য স্বতন্ত্র জলের বন্দোবস্ত থাকে সেই জলকেই মিঠাপানি বলি—স্নানাগারটী জাহাজের এক প্রান্তে অবস্থিত বেশ ঘেরাঘোরা ছোট্ট একটী কাঠের ঘর ইহাতে একটী wash stand আছে একটী বড় গ্যালভানাইজড্ বাথ টব আছে দেয়ালে একটা ব্রাকেটমারা তাহাতে এক টুকরা সাবান রহিয়াছে একটা ছোট টুল আছে দেয়ালে সেটকরা একখানা আয়না তাহার পাশে চিরুণী ব্রাস রহিয়াছে—দেয়ালগুলি কাঠের পাঁচ ফুটের উপর সবটা কাঁচ আটা। স্নান শেষ করিয়া মাথাটা তোয়ালে দিয়া ঘসিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেওয়ালের উপর যেখানটা কাঁচ লাগান আছে—সেখানটায় দৃষ্টি পড়িল—দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র তীব্র চক্ষুর হিংস্রদৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত; মুখের উপরটী মাত্র দেখাইতেছিল—যতটুকু দেখিলাম তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম—এ সেই কাণা চীনাম্যান চোখচোখি হইবামাত্র সব অন্তর্হিত হইল—আমি ভিজা কাপড়েই বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—কেউ কোথা নাই—তৎক্ষণাৎ মেট্‌কে ডাকাইলাম সারং ও অন্যান্য লোকেরা আসিয়া পৌছিল—চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম কিন্তু কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—গোলমালে কাপ্তেনের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ছিল তিনিও বাইরে এলেন—কিন্তু সেই চীনাম্যানের খোঁজ পাওয়া গেল না—আমি বড় চিন্তিত হইলাম—এর মানে কি? অবশ্য আমার সঙ্গে সেই চীনাম্যানের কোনরূপ জানাশুনা নাই অথচ সে আমায় অনুসরণ করে কেন? বিশেষতঃ তাহার সেই এক চক্ষুর তীব্রদৃষ্টি মনে হইলে শরীর যখন শিহরিয়া

উঠে—কি ভয়ানক হিংস্র দৃষ্টি? কাপ্তেন সাহেবকেও মুখ বিমর্ষ দেখিলাম—তিনি আমায় ডাকিয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা কি রকম বুঝছেন "আমি বলিলাম বুঝতে আর পার্চ্ছি কৈ—পারলেত এর মীমাংসা করিতাম" "এত খোঁজ করেও যখন কোন সন্ধান পাওয়া যায় না—তখন সে আসেই বা কোথা থেকে আর যায়ই বা কোথায়—ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হয় কি?" আমায় হাসি পাইল বলিলাম "এই বিংশশতাব্দীতে প্রকাণ্ড দিবালোকে যা স্পষ্ট দেখিলাম তাকে ভৌতিক ব্যাপার বলা আমার সাধ্য নয়—আর ভূতেরা কি ডেকের উপর জুতার দাগ ফেলে যায়" "ঐ দাগটাই তো আরো মুস্কিল করেছে এখন এ রকম শত্রু নিয়ে সমস্ত যাত্রাটা সম্পন্ন করাতো বড় সুবিধা নয় বিশেষতঃ চীন ব্যাটারা বড় হিংসুটে এমন প্রতিহিংসা-পরায়ণ জাত পৃথিবীতে নেই; যাক্ কাল ভোরে আমরা আরাকানে পৌছিব সেখানে গিয়া ডাক্তার শঙ্করলালকে একটা তার করে দিতে হবে তাঁর উত্তর পেলে যা হয় করব—এরকম ভয়ে ভয়ে কাজ করা আমার সাধ্য নয়" "সেই ভাল কথা আজকার দিনটা আর রাতটা সকলেই খুব সতর্ক থাকৃতে হবে" "ও আপনি এখনও ভিজে কাপড়ে রয়েছেন যে যান্ কাপড় ছাড়ুন গে আমিও দেখি চেষ্টা করে যদি আর একটু ঘুমাইতে পারি সারারাত আমার duty পড়বে।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন আমি কেবিনে যাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলাম এমন সময় মিশিরজী আসিয়া বলিলেন "ডাংদারবাবু মাজী বোলায়েহেঁ অগত্যা মিশির ঠাকুরের মাজীর আদেশ পালন করিতে নীচে নামিয়া গেলাম। তখন পোর্ট হোলগুলা সব খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে আর

তার মধ্য দিয়া ঝলকে ঝলকে আলো আসিয়া জাহাজের খোলটি আলোয় আলো হইয়া গিয়াছে কোণের দিকে একটি পোর্টহোলের ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম দেখি পোর্টহোলের একটা মস্ত মোটা পেরেক মারা রহিয়াছে পেরেকটা নূতন আর তাহাতে একটু কাল কাপড়ের টুকরা ঝুলিতেছে সেটুকু হাতে লইয়া বুঝিলাম এ সেই চীনাম্যানের জামার ছিন্নাংশ—এই তা হলে তাহার যাতায়াতের পথ। কিন্তু পোর্টহোলের বাহিরে তো গভীর সমুদ্র সে তবে যায় কোথায়? সে তো জলচর নহে যে সমুদ্র গর্ভ হইতে উঠিয়া আসে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম কোথাও কোন রকম চিহ্ন নাই—বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। অন্যমনস্কভাবে কেবিনের নিকট যাইলাম "আসুন ডাক্তারবাবু, বসুন" বলিয়া হাস্যাননা কিশোরী আমায় অভিবাদন করিলেন, আমি বসিয়া রোগী পরীক্ষা করিলাম—সেই পূর্ব্ববৎভাব, নাড়ীর স্পন্দনও পূর্ব্ববৎ তাঁহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, এখনো কি ইনি ঘুমাচ্চেন" "না, ঠিক ঘুম নয় একটা আচ্ছন্নভাব—"কথা টথা কইতে পারেন" দৈবাৎ দু একটি সে এত অস্পষ্ট যে আমি ছাড়া অন্যের বুঝে উঠা শক্ত" একটা ডিসে কিছু ফল ও কিছু মিষ্টান্ন ও একগ্লাস জল আমার সামনে রাখিয়া তিনি বলিলেন "ডাক্তারবাবু একটু জল খেয়ে নিন—খাবার হতে এখন দেরী আছে" "না এসব আবার কেন" "তা কি হয় নেয়ে উঠে শুধু মুখে থাক্‌লে পিত্তি পড়বে যে—আপনি ডাক্তার আপনাকে কি তাও বলে দিতে হবে" "ডাক্তারদের কি ঘেন্নাপিত্তি থাকে? সে সব কলেজে হাঁসপাতালে রেখে আমরা বেরিয়ে আসি" "যাক্ তা বল্লে আমি শুনছি না—এটুকু খেয়ে নিন" "আপনি বড় জুলুম

কণ্ঠে আরম্ভ করলেন—আমার ডাক্তারী করবার কথা—জল খাবারের কথা তো নেই”—“তা হলে আপনি আমাদের ঠিক ডাক্তারী হিসাবেই দেখবেন—নেহাৎই পরের মতন—কেমন?” “না তা কেন—আচ্ছা আপনি দুঃখ করবেন না আমি খাচ্ছি” বলিয়া রেকাবীতে মনোনিবেশ করিলাম বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনার বাড়ী কোন দেশে—আপনি রেঙ্গুনের ডাক্তার কখনই নন্, তাহলে আপনার কথা নিশ্চয়ই কখন না কখন শুনতুম” “না আমি এর আগে কলকাতায় থাক্‌তুম—দেশ আমার বর্দ্ধমান জেলার এক পাড়াগাঁয়ে তবে সেখানে আমার নিজের কেউ নেই” “বলেন কি কেউ নেই—তা তো বটেই কেউ থাক্‌লে কি আপনাকে এত দূর দেশ একলা থাক্‌তে দিত?” বালিকার এই সরল কথাগুলি আমার হৃদয়ের একটা খুব কোমলস্থানে আঘাত করিল—আমার কেউ না থাকার দৈন্য যেন বিরাট আকারে প্রত্যক্ষীভূত হইল সত্যই তো যার কেউ থাকে সেকি সমুদ্রে একা ভাস্‌তে থাকে! আমি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলাম—অসাবধানে বলিয়া ফেলিলাম—আপনার নামটা কিন্তু আমি জানি না—অবশ্য বাঙালী সমাজে মেয়েদের নাম জিজ্ঞাসা করার প্রথা নাই কিন্তু আতুরে নিয়মো নাস্তিঃ” বলিয়াই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম “আমার অসভ্যতা মাফ্ করবেন এটা জিজ্ঞাসা করিবার কোন অধিকার আমার নাই আমি অন্যমনস্কে—” “যাক্ আপনাকে ক্রটী স্বীকার করতে হবে না—আপনি যখন আমাদের সমস্ত ভার নিয়েছেন তখন আপনার অধিকার আছে বৈকি,—আমার নাম ‘সান্যোয়া’ এটা অবশ্য ডাক নাম্ আমার ভাল নাম হচ্ছে নীহারিকা—তবে সে নাম

বড় বেশী ব্যবহার হয় না—আমাকে দাদাবাবু সালোয়া বলেই ডাকৃতেন চাঁপাফুলকে বর্ম্মীজরা সালোয়া বলে—" "নামটী আপনার ঠিক উপযুক্ত তা যাক্ যখন এতটা সহ্য করলেন তখন আমিও আপনাকে সালোয়া বলেই ডাকব সেটাও বরদাস্ত কর্ত্তে হবে।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া সালোয়া হাসিয়া উঠিল—আমিও জলযোগান্তে উঠিয়া আসিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আসিয়া অবধি ডেকের উপরে ইজিচেয়ারে শুইয়া ভাবিতেছি কি যে ভাবিতেছিলাম জানিনা—যা আপনারা ভাবছেন তাইই—কোথা থেকে যে এত ভাবনা আমার শূন্য প্রাণটাকে দখল করে ফেলেছিল তা জানি না—আগে ত কিন্তু এত ভাবতুম না—এত ভালবাসা এল কোথা দিয়ে—চোখ দিয়ে—না? দু দিন আগে যে এক উপার্জ্জনের ভাবনা ছাড়া অন্য ভাবনা ছিল না—এখন সে ভাবনা নাই তাই অন্য ভাবনা এসে জুটেছে—পৃথিবীতে কিছু খালি থাকবার জো নাই—ভগবানের সৃষ্টি কোথাও অসম্পূর্ণ থাকে না—আকাশটা শূন্য তাই সেখানটা নয়নরঞ্জন মেঘ দিয়া ঢাকা, মেঘও শূন্য তাই তাহার ভিতর চোখভোলান বিদ্যুৎ থাকে, আর থাকে মানুষের প্রাণরক্ষাকর অমৃতোপম বারিবিন্দু—জমী পতিত হয়ে থাকৃলে সেখানে আগাছা জন্মায়—মরুভূমিও শূন্য থাকে না—সেটাও তপ্ত বালিতে ভরা—কিছু খালি—কোথাও শূন্য নাই—চারিদিক ভরা—তা ভালতেই হোক

নিরুপমা-পুরস্কার।

আর মন্দতেই হোক্ তাই যখন ঠিক নির্ভাবনা হবার সময় এল তখন কোথা থেকে অপ্রত্যাশিত কতগুলি এলোমেলো ভাবনা এসে প্রাণটার ভেতর ঢুকল—মনে করি ভাবিব না—কিন্তু না ভাবিয়াও যে পারি না—আর ভাবনার ভেতর আশা নিরাশার ঘাত প্রতিঘাত বর্ত্তমান থাকায় তাহাকে মধুর হইতে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল—তাই এ ভাবনা ছাড়িতে পারি নাই—সত্য বলিলে বলিতে হইবে ছাড়িতে চাহি নাই। নামটা বেশ মিষ্টি নয় "সালোয়া" কিনা চাঁপা—হুঁ ঠিক কনকচাঁপার মতই রং সেই রকম নিটোল সুন্দর আর আসন্ন দুঃখের একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়ে মুখখানি একটু ম্লান করে রেখেছে—আর চোখ দুটী—আমরি মরি—হঠাৎ সুখের স্বপ্ন টুটীল, পাঁড়েজী আসিয়া জানাইলেন "খানাঘরে খাবার দিয়া আসিয়াছে" এটা একেবারেই গদ্য, তথাপি আবশ্যকীয় বলে উঠ্তে হল, ভাবনাটা স্থগিত রইল—খেতে গিয়ে দেখি সেখানে বসিয়া সালোয়া—যতক্ষণ খেয়েছিলাম এটা খান ওটা খান ঠাকুর আর একটু তরকারী আন্ আর দুটী ভাত দেবে—এ রকম অনেক ছোট খাট মধুর অত্যাচার সহ্য কর্ত্তে হল—বরাবরই মেসের ঠাকুরের স্নেহ যত্নে লালিত পালিত এ সব কখনও দেখি নাই—তবে জীবন মধ্যাহ্নে আসিয়া হঠাৎ একেবারে এত যত্ন যেন বড় মিষ্ট লাগিল। বাস্তবিক বাঙালীর মেয়েগুলি যেন সেবা ও যত্নের প্রতিমূর্ত্তি—এ হতভাগ্য জাতির যতই অধঃপতন হোক্—এখনও এর গর্ব্ব করে দেখবার জিনিষ আছে বাংলার নারী।

তবে যেরকম সংস্কারের উপর সংস্কারের ঢেউ উঠ্ছে এ জিনিষ যে আর কতদিন থাকে তা বল্তে পারি না সংস্কার ক্রমশঃই সংহারে

পরিণত হতে যাচ্ছে! হয়ত আর পঞ্চাশ বৎসর পরে এ চিত্রও কল্পনা করে ভবিষ্যৎ গ্রন্থকারকে দেখাতে হবে। অসভ্য সায়েস্তা খাঁর আমলের টাকায় ৮ মণ চাউলের মত সভ্যযুগে ৮ টাকা মণেও দুষ্প্রাপ্য হইবে। সভ্যতা আমাদের অনেক জিনিষ দিয়েছে কিন্তু আবার অনেক জিনিষ কেড়েও নিয়েছে সেটা কেউ বলবে আমাদেরই দোষ কেউ বলবে অদৃষ্টের দোষ—তা যারই দোষ হক্। নবীন সভ্যতা নবীন শিক্ষা আমাদের বাহিরটাকে ঘসে-মেজে সাফ্ করে যত ময়লা আমাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছি—এ ময়লা যদি না বার কর্ত্তে পারি তবে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা উন্নতি সব সুদূর পরাহত রহিবে। সাবধান বাঙ্গালী! হেলায় এ রত্ন হারাইও না—হারাইলে তোমার নিজস্ব বলিয়া গর্ব্ব করিবার আর কিছু থাকিবে না হয়ত কালে তুমি উন্নত হইয়া বড় বড় সভ্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে একসঙ্গে বসিবার অধিকার পাইবে কিন্তু তখন তোমার দেখাইবার মত নিজের জিনিষ কিছু থাকিবে না—যাদের জিনিষ ধার করে তুমি বড় হবে সেই জিনিষতো তাদের দেখান চলিবে না। খাইতে খাইতে সালোরাকে বলিলাম "দেখুন এত অযথা যত্ন আদর করে আমার অভ্যাস খারাপ করে দেবেন না—দুদিন পরে যখন আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে তখন আবার সেই ঠাকুর চাকরের দয়া যত্ন—সেই ঘড়ির কাঁটার মত নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি কি আর ভাল লাগবে" "আপনি কি তবে আমাদের কলিকাতায় পৌছে দিয়াই চলে যাবেন নাকি" "তা এখন কি করে বলি—আমি ত পরের চাকর" "না ডাক্তার বাবু তা হবে না তা হলে আমাদের বড় কষ্ট হবে—আপনাকে তো বলেছি

আমাদের আর কেউ নেই।" "কেন ডাঃ শঙ্করলাল তো তোমার দাদা বাবুর বিশেষ বন্ধু" "হাঁ তা বটে তবে তিনি তো ঠিক আমাদের মত মানুষ নন তাঁর সঙ্গে তো এত কথা কইতে পারি না—দেখুন সত্য বলতে কি আমার এক এক সময় এই শঙ্করলালকে বড় ভয় করে মানুষের অত ক্ষমতা হওয়া কি ভাল—মানুষ মানুষের মত না হলে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা হয় না—কেবল ভয়ই কর্ত্তে পারা যায়।" "তা বটে—তবে তাঁকে ভয়ের কোন কারণ নাই তিনি মহাজ্ঞানী পুরুষ।" "এ রকম পুরুষের তপোবনে বাস করাই ঠিক—সংসারের সমাজের কোন কাজ তাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয় যদি বা কখন তারা সংসারের মধ্যে এসে পড়ে তো কক্ষচ্যুত, উল্কার মত যেখানে পড়ে সেখানটা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়।" কথাগুলি তখন বেশী ভাবিয়া দেখি নাই বটে কিন্তু পরে তাহাদের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম—সত্যই মহাপুরুষদের দূর থেকেই প্রণাম করা কর্ত্তব্য—সংসারের ও সমাজের সঙ্গে তাঁদের সজ্ঘর্ষণ হওয়া সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় নয়—যেমন সূর্য্য দূর থেকে আলোক ও উত্তাপ দিয়ে জগতের অনেক উপকার করেন কিন্তু পৃথিবী তাঁর সান্নিধ্যে গমন করিলে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইবে। "বেলা হল আপনি দুটী খেয়ে নিয়ে নীচে যান আমি একবার আপনার দাদা বাবুকে দেখ্‌তে যাব।" বলিয়া আমি উঠিয়া বাথ্‌রুমে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া আসিলাম।

আসিতে আসিতে দেখিলাম কাপ্তেন সাহেব উঠিয়াছেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আহারাদি করেছেন তিনি বলিলেন "হাঁ"—আমি পকেট হইতে সেই কাল কাপড় টুকরাটা দেখাইয়া পোর্টহোলের পাশে

পেরেক মারার কথা বলিললাম—তিনি দেখিয়া গম্ভীর হইলেন—বলিলেন আচ্ছা সেখানে একটা আলো ও একজন লোক আজ পাহারায় রাখিব। কি বলেন” “হাঁ তাহলে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যেতে পারে।” “কিন্তু ব্যাপারটা আমার আদৌ ভাল বোধ হচ্ছে না—লোকটা দু-দুবার দেখা গেল এত খোঁজা খুঁজিতে তবু কোন সন্ধান মিল্‌ল না—অথচ সে কোন অনিষ্ট করে নাই এটাও ঠিক—বসুন না বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া দিলেন—আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম—তিনি চুরুট টানিতে নানা দেশের গল্প করিতে লাগিললেন—চীনের কথা জাপানের কথা জাভাদ্বীপের কথা—সে সব দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি দোষগুণ অনেক গল্প করিলেন—আমি মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া সেই সব গল্প করিতে লাগিলাম হঠাৎ কালিং বেলের ঝন্ ঝন্ রবে কাণে উঠিল—অর্দ্ধ শ্রুত গল্প ফেলিয়া আমি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গিয়া যা দেখিলাম তা অতি ভয়ানক রোগীর অবস্থা খুবই শোচনীয়—শয্যার উপর রোগী হাত পা খেঁচিতেছে মুখে গাঁজলার ন্যায় বাহির হইতেছে—সালোয়া রোগীর গায়ে হাত দিয়া বসিয়ে কাঁদিতেছে আমায় দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল “ডাক্তার বাবু আমার সর্ব্বনাশ হয় বুঝি—আর বুঝি দাদাবাবুকে রাখতে পারি না—”

আমি পকেট হইতে একটা ড্রপার বাহির করিয়া রোগীর মুখে বিন্দু বিন্দু জল দিতে লাগিলাম—সালোয়াকে বলিলাম 'তুমি' চট্ করে উপরে আমার কেবিনে একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ আছে নিয়ে এস"—বিপদে লজ্জা থাকে না—সালোয়াকে আজ ভ্রমে তুমি বলিয়া ফেলিলাম। সে ছুটীয়া গেল—আমি খুব ভয় পাইয়াছিলাম তবে একটা আশা ছিল যে ডাক্তার শঙ্করলাল যে ঔষধ ও উপদেশ পত্র পাঠাইয়া ছিলেন তাহাতে ঠিক এই রকম লক্ষণ প্রকাশে ব্যবহার জন্য একটা ঔষধ ছিল—চকিতের মত সালোয়া ব্যাগ লইয়া আসিল—আমি সেই ছোট বাক্সটী বাহির করিয়া একটী ঔষধের শিশি বাহির করিয়া লইলাম—সবুজ রংএর ঔষধ তিন ফোঁটা মাত্র রোগীকে অতি কষ্টে সেবন করাইয়া নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিলাম ক্রমশঃ হস্তপদপ্রক্ষেপ বন্ধীভূত হইল, মুখের লালাস্রাব প্রশমিত হইল চক্ষু স্বভাব ফিরিয়া পাইল অবশ্য এসব ঘটিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল ততক্ষণ কিন্তু আমরা দুজনেই নির্ব্বাক চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় বসিয়াছিলাম, দুজনেরই মুখে দারুণ উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; যখন রোগী অস্ফুটস্বরে "আঃ" বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন তখন আমি সালোয়ার দিকে চাহিয়া বলিলাম "আপনি এবার নিশ্চিন্ত হউন আর কোন ভয় নাই" "আপনার ঋণ অপরিশোধ্য; আমি বয়সে ছোট,আমায় যেমন আগে তুমি বলেছিলেন এখন থেকে তাই বলবেন আর 'আপনি' বলে আমার ঋণের ভার বাড়াইবেন না।" সালোয়া যে তুমি বলাটা লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা দেখিয়া মনে বড় আনন্দ পাইলাম এইরকম ছোটখাট ব্যাপারেই আপনার পর ধরা যায়, আর যেটা আমরা সভ্যতার খাতিরে আদব

কায়দা রূপে ব্যবহার করি সেটা যে বাস্তবিকই মূল্যহীন কৃত্রিম তা সকলেই জানেন তবুও সেই খুঁটীনাটীর ত্রুটী হইলে লোককে লোক অসভ্য বলে ঘৃণা করে। আমি সহাস্যে বলিলাম "তাই হবে সালোয়া এখন থেকে তোমায় তুমিই বলবো" উত্তরে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ একটী সলজ্জ দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপিত করেছিল—তবে সে দৃষ্টি নির্ব্বাক হইলেও যেন আমার কাণে কাণে বল্‌লে "ওগো তোমার কাছে যে আমি কত কৃতজ্ঞ তা কি করে বল্‌ব"—তবে ভালবাসা নিবেদন করেছিল কিনা তা ঠিক বুঝতে পারি নাই—আমি বলিলাম দুধ থাকেতো একটু গরমকরে খাইয়ে দাও"—সালোয়া বললে "দুধ নাই বিলাতী ফুড্ আছে—আমি বলিলাম তাই দাও"। সে একটী বাটীতে স্প্রীট ষ্টোভে জল গরম করিতে লাগিল আমি দেখিতে লাগিলাম ফুড্ তৈয়ার করিয়া খাওয়ান শেষ হইলে রোগী যেন শরীরে একটু সজীবতা অনুভব করিলেন, অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কি বলিলেন আমি বুঝিতে পারিলাম না—আমার পাশেই অল্প দূরে সালোয়া বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে ছিল সে বলিল "হ্যাঁ উনিই ডাক্তার—ওঁর নাম শেখর কুমার বসু" আবার রোগী কি বলিল, সালোয়া বলিল "হ্যাঁ ওঁকে শঙ্করদাদা পাঠাইয়াছেন"—আবার রোগী কি বলিল সালোয়া আমায় উদ্দেশ করিয়া বলিল "ডাক্তার বাবু দাদা মহাশয় বলছেন যে উনি আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারছেন না সেজন্য ওঁর বড় দুঃখ হচ্ছে আর সেজন্য আপনি কিছু মনে করবেন না—বুঝলেন" আমি রোগীর উদ্দেশে বলিলাম "সেজন্য আপনি মোটে ভাববেন না, ভগবানের কৃপায় এ-ধাক্কা যে সামলাতে পেরেছি এই আমার সৌভাগ্য" আবার সালোয়া বলিল "হ্যাঁ সেজন্য উনি বড় কৃতজ্ঞ

এবং যদি ভালহয়ে উঠ্‌তে পারেন তো এ ঋণ উনি শোধ দেবেন" "ওঁকে বলুন এতে কৃতজ্ঞতার কিছু নেই এ আমার কর্ত্তব্য—আর তা নাহলেও আপনি বাঙালী আমার স্বজাতি—আপনাকে যথাসাধ্য রক্ষা আমাকে কর্ত্তেই হোত।" এর পরে দুজনে চুপি চুপি কি কথা হল তা বুঝতে পারলুম না তবে সালোয়ার গালদুটী লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে উঠ্‌ল আর তাহার সেই শুষ্ক অধরে ক্ষীণ হাস্যের একটু মৃদু রেখা ফুটিয়া উঠিল। ঘটনাটার সময় ও অন্যান্য বিবরণ একটু লিখিয়া রাখিব মনে করিয়া পকেট হইতে ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া দেখিলাম পকেট বইটা উপরে ফেলিয়া আসিয়াছি—সালোয়াকে বলিলাম একটু কাগজ দাওতো, সে অন্যমনস্কে ডেস্কের নীচে থেকে একটা খাতা বের করে দিলে আমি একটু কাগজ ছিঁড়িয়া লইব মনে করিয়া খুলিয়া দেখি সামনের পাতাতেই গোটা গোটা স্পষ্ট স্পষ্ট গোল গোল অক্ষরে লেখা "শ্রীশেখর কুমার বসু ডাক্তার আর নীচে লেখা আছে শ্রীমতী সালোয়া দাসী আবার সে লাইনটা কাটিয়া লেখা হইয়াছে শ্রীনীহারিকা দত্ত,হঠাৎ চিলের মত পড়িয়া সে খাতা খানা টানিয়া লইল আমি হাসিয়া ফেলিলাম—সে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাও তুমি—আপনি ভারি দুষ্টু" "কেন খাতাটা পড়েছি বলে—তা তুমিই তো আমায় দিলে" তাহার মুখে আর কথা আসিল না, লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল—আমি বলিলাম "ছি লক্ষীটি কেঁদোনা, দেখেছি—তাতে হয়েছে কি,তোমার দাদাবাবু সেরে উঠুন হয়ত এ লেখা একদিন সার্থক হইবে।" আর বেশী বলিবার আমার ক্ষমতা ছিলনা—আনন্দে আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল আমি ধীর পদক্ষেপে বাহিরে আসিলাম; তবে মনে হল যেন মনের

ভেতর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল একটা সংশয় যেন দূরীভূত হল অজানিত আনন্দে আমার হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল—সে দিন আনন্দের যে এক অপূর্ব্ব আস্বাদন পাইয়াছিলাম—তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই—আসিবার সময় একবার পেছন ফিরে চাহিয়া দেখি সালোয়া দাঁড়াইয়া আছে চক্ষে ও অধরে হাস্য, গণ্ড দুটী লজ্জার সিঁন্দুরমাখান—মুখের উপর আনন্দ ও লজ্জা যেন জড়াজড়ি করিয়া ভাসিয় বেড়াইতেছে—চোখোচোখী হইবা মাত্র চোখ নামাইল, কিন্তু চোখের তারা দুটী যেন বলিয়া গেল ছিঃ! তুমি ভারি দুষ্টু ভালবেসেছি বলে কি এম্নিকরে ধরে ফেলে লজ্জা দেয়।" আমি ফিরে আসিলাম বটে মনটা কিন্তু সেই কেবিনে ফেলিয়া গেলাম এবং ব্যাগটিও লইয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কাপ্তেন সাহেব বলিলেন "কি মহাশয়! রোগী আজ কেমন" "ওঃ খুব টাল আজ সামলেছে" "আর দুটা দিন সামলালে আমরা ও বাঁচি—" আমি চুপ করিয়া রহিলাম লজ্জায় হউক বা যে জন্যই হউক আর নীচে যাই নাই, উপরেই ছিলাম ডেকের উপর একটা সতরঞ্চি বিছাইয়া বেশ লম্বা হয়ে পড়ে ছিলাম—হাতে একখানা বই ছিল তবে সেখানা যে পড়ছিলাম না 'তা নিশ্চয়ই' কারণ কি পড়ছিলাম তা মনে নেই বা যা পড়ছিলাম তার অর্থবোধ হইতেছিল না। কেন এমন হয় জানেন?—বোধ হয় মনটা বশের বাইরে গেলেই এমন হয়। মনটা আজ আমার বিদ্রোহী হয়েছিল, সে কোন আইন কানুনের ধার না ধারিয়া আজ স্বেচ্ছাচারী শিশুর মত আনন্দে ছুটাছুটী করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল—সে একাগ্রচিত্তে একখানি সুখের ছবি আঁকিতেছিল একটী সুন্দর গৃহ যাহাতে সুখ শান্তি উছলিয়া পড়িতেছে, আর ততোধিক

সুন্দর একটী গৃহলক্ষ্মী যার কমলচরণের কোমল স্পর্শে গৃহ খানি সুখে আনন্দে শান্তিতে প্রীতিতে প্রফুল্ল হইয়া ছিল—আর সেই অন্নপূর্ণারূপিণী সর্ব্বসুখদায়িনী কল্যাণীর পার্শ্বে একটী উন্মাদ ভিখারীর ছবি আঁকা চলেছিল, যদি না চায়ের বাটী হাতে করে মিশির ঠাকুর ধ্যানভঙ্গ করে দিত—একবার মনে করলুম নীলকণ্ঠের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করে দ্বারভাঙ্গাবাসী এই দীর্ঘকায় কন্দর্প কে ভস্মীভূত করিয়া দেই কিন্তু দৃষ্টিটা চাএর বাটীতে পড়াতে ক্রোধ প্রশমিত হইল; কন্দর্প ঠাকুরও অক্ষত দেহে পাকশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চা খাইলাম বটে কিন্তু মুখে যেন বিস্বাদ লাগিল মনে হইল এটা মিশির ঠাকুর না আনিয়া যদি তাহার মা'জী আনিতেন তো কত মিষ্ট হইত, কাল একান্ত অপরিচিত হইয়াও ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু পাইয়াছিলাম—আজ একান্ত আপনার জন হইয়া তা'কি খোয়াইব নাকি—এরকম আপনার অথচ পর হইয়া থাকিতে আমি জানি না—আমি সোজা সুজি যা হয় একটা হইতে পারি, হয় পূরা আপনার বা পূরা পর—ত্রিশঙ্কুর মত মাঝামাঝি অবস্থায় থাকিতে রাজি নই—আর এই মাঝামাঝিরই যত বিপদ। বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থর গত ন দেবায় ন ধর্ম্মায়—এঁদের আয় অল্প অভাব বেশী; লোকলৌকিকতা দানধ্যান সবই করা আবশ্যক অথচ উপযুক্ত অর্থ নাই, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে আত্মীয় স্বজন ঘৃণা করিবে সমাজ রক্ত চক্ষু বাহির করিয়া শাসাইবে। ধনী সে তাহার গরীব আত্মীয়কে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিবে না অথচ সে ধনী বলিয়া সকলে তাহার মন যোগাইবে তোষামোদ করিবে সে সবাকার বুকের উপর বসিয়া অত্যাচার করিবে আর তার টাকার থলির দিকে

চাহিয়া সকলে জড়ের মত মুক হইয়া থাকিবে সেখানে দন্তস্ফুট করিবে না। দরিদ্র যে সে সমাজের ধার ধারে না—সে এমন উচ্ছৃঙ্খল, যে সমাজ তাহাকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যত বিপদ এই মাঝখানের লোকের—তাই আমি মাঝামাঝি ব্যবস্থার বিরোধী। চা পান শেষ হইল—হাতে করিবার মত কাজও ছিল না—পড়িবার বই ছিল বটে তবে পাঠে মনকে সংযত করিতে পারি নাই বলিয়া—বইখানি বন্ধ করিলাম—ঔষধের ব্যাগটা নীচে পড়িয়াছিল সেইটা আনিবার অছিলার একবার নীচে যাইলাম দেখিলাম সালোয়া পিতামহের পদ প্রান্তে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে—আমায় দেখিয়া বলিল "এই যে ডাক্তারবাবু আসুন—আসুন, "এখন কেমন আছেন" বলিয়া কেবিনে ঢুকিলাম—সালোয়া একটু সরিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল—আজ আর তাহার সে বর্ম্মীজ পোষাক নাই—একেবারে সাদাসিধা বাঙালীর মেয়ের মত বেশ। পরিধানে একখানি চওড়া কালা পাড় সাড়ী, গায়ে একটী শুভ্র সেমিজ। আমায় দেখিয়া মাথায় কাপড় দেওয়াটা এই প্রথম—উত্তরে সে বলিল "এখন ভালই আছেন—বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন।" ভগবানকে ধন্যবাদ "বাস্তবিক যা হয়েছিল আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম" "আমি তো আশা একরকম ছেড়েই দিয়াছিলাম—বাস্তবিক আপনার ঋণ অপরিশোধ্য।" "তবে শোধ দিয়ে কাজ নেই—তবু আমার মত গরীব মহাজনের একটা খাতক আছে বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারব।" "ভারি তো খাতক—তার আবার মহাজন," "যেমন

খাতক তার তেম্নি মহাজন—আর একটা কথা ভাবছিলাম—আপনি সমস্ত দিন একা থাকেন—সময় কাটান কিকরে—আমি তো সময় কাটান বড় কঠিন দেখছি," "তা হলে খুব কষ্ট হচ্ছে বলুন" "কষ্ট ঠিক নয় তবে হ্যাঁ"—আর বেশী বলবার মত কথা জোগাড় হইতেছিল না দেখিয়া ডু-একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম "আমার ব্যাগটা দিন তো," "ওঃ, তাই বলুন ব্যাগটা নিতেই এসেছেন—এই নিন্ বলিয়া সালোয়া ব্যাগটা আগাইয়া দিল—আমি ও আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার ছল খুঁজিয়া না পাইয়া অগত্যা উপরে আসিলাম—ব্যাগটা খুলিয়া ঔষধ গুলি সাজাইয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়া কেবিনের দরজা বন্ধ করিয়া উপরে আসিলাম তখন ও অনেক বেলা ছিল—ডেকের উপর বসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের শোভা দেখিতে লাগিলাম—সমুদ্র বক্ষে সূর্য্যাস্ত বাস্তবিক দেখিবার জিনিস। তাহা বক্তৃতা করিয়া বা লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র! বিশেষতঃ আমার মত রস-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ডাক্তারের নিকট। নীচে ছল ছল কল কল করিয়া প্রশান্ত তরঙ্গে বহ-মান নীল জলের স্রোত,—উপারে আদিহীন অন্তহীন নীলমেঘের রাশি, সেই মেঘের পশ্চিমদিকটায় ধীরে ধীরে নানা বর্ণের বিকাশ হইতে লাগিল তবে ঘোর লাল রংটা ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া বাকী রং গুলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তার পর আবার সেই লালরং এ আবার ছোট ফাট্ ধরিল আর তাহার মধ্য হইতে কাঁচা সোণার রঙ ফেটে পড়তে লাগল, সেই নীল জলরাশিতে সেই বিচিত্র বর্ণশালী মেঘের প্রতিবিম্ব, নয়ন সম্মুখে কি আনন্দ সৃজন করে তাহা সত্যই বর্ণনাতীত

ভাষার অধিকার-বিচ্যুত। তারপর ধীরে ধীরে—অতিধীরে যেন একখানা ধোঁয়া রংএর মেঘ এসে অলক্ষ্যে সেই সুন্দর দৃশ্যকে আচ্ছন্ন করিল, আলোক ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল—তমসা আসিয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিজের ধূসর বাস মেলিয়া দিয়া রজনীসুন্দরীর সংবর্দ্ধনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কালো আকাশে আবার আস্তে আস্তে একটা দুটা করিয়া তারা ফুটীতে লাগিল—মনে হইল যেন নিপুণানর্ত্তকীর চরণপদ্ম-বিক্ষিপ্ত হীরার টুক্‌রা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—নানারকম জলচর পক্ষী যারা এতক্ষণ ঝাঁক বাঁধিয়া জলের উপর ভাসিতেছিল, দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল—তাহাদের পক্ষসঞ্চালনজাত শন্ শন্ শব্দ যেন সান্ধ্য অন্ধকারের সহিত বিভীষিকা মিশাইয়া দিতে লাগিল—আমি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কতক্ষণ যে ডেকের উপর বসিয়া অন্ধকারের মধুরত্ব উপভোগ করিতেছিলাম তাহা ঠিক স্মরণ নাই তবে কখন যে তাহার মধ্যে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহা আমার লক্ষ্য হয় নাই। ক্ষীণ চন্দ্র ক্রমশঃ পুষ্টি-লাভ করিয়া যখন ডেকের উপর মৃদু জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিল তখন যেন চটকা ভাঙ্গিল—কেবিনের দিকে নজর পড়াতে দেখি কেবিনের দরজা খোলা—ছুটিয়াগিয়া দেখিলাম বক্সের উপর আমার হাতব্যাগটী খোলা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে ডাক্তার শঙ্করলালের প্রদত্ত

ঔষধের বাক্স নাই। তৎক্ষণাৎ কাপ্তেনকে ডাকাইয়া সব বলিলাম তিনি বলিলেন আপনি কি কাহাকে ও সন্দেহ করেন?" "সন্দেহ করিবার মত লোক দেখিতে পাই না—সেই কাণাচীনাম্যান ছাড়া" "তাকে কি আপনি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন?" "না আমি কাহাকেও দেখি নাই—"আলোক লইয়া আসপাস দেখিতে দেখিতে দেখিলাম ডেকের উপর আবার সেই রোপসোল জুতার ছাপ; দেখিয়া বুঝিলাম আসিবার সময় জুতার তলা ভিজিয়া গিয়াছিল তাহাতেই দাগ পড়িয়াছে এবারে কিন্তু কয়লার গুঁড়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।" "আচ্ছা, ঔষধ ছাড়া আর অন্য কোন জিনিস চুরি গিয়াছে কিনা দেখুন দেখি—" আমি সব দেখিয়া বলিলাম সব জিনিসই নাড়া চাড়া করা হইয়াছে কিন্তু টাকা কড়ি পুস্তক কি আমার সঙ্গে আনীত অন্য ঔষধ বা যন্ত্রপাতি কিছুই লয় নাই কেবল ডাক্তার শঙ্করলাল প্রদত্ত সেই ঔষধের বাক্স ও তাঁহার লিখিত উপদেশ পত্র ও আমার নামীয় চিঠিখানি নাই। কাপ্তেন বলিলেন "দেখুন ডাক্তারবাবু—বলা বাহুল্য যে আমার জাহাজের সমস্ত লোকই খুব বিশ্বাসী—এ কাজটা খুব দায়ীত্বের বলে ডাক্তার শঙ্করলালের আদেশ অনুযায়ী সমস্ত লোক আমি নিজে পছন্দ করে নিয়েছি—সুতরাং তাদের দ্বারা যে এ কাজ হয়েছে তা আমি মনে করি না" "আমিও না, কিন্তু চীনাম্যান যে রকম উৎপাত আরম্ভ করেছে তাতে তো আর স্থির থাকা অসম্ভব—কি করা যায় বলুন।" "কি বলব বলুন—বলবার তো কিছু খুঁজে পাইনে যাহ'ক আজ সমস্ত পোর্টহল একেবারে বন্ধ করিয়ে দিচ্ছি—যদিও আমার বিশ্বাস হয় না যে সমুদ্র বক্ষথেকে উঠে সে লোক পোর্টহোল

দিয়ে যাতায়ত করে" "ডাক্তারসাহেবকে তার করা হয়েছে—"? "হ্যাঁ সে আমি সকালেই করিয়েছি—বোধ হয় ভোরে আমরা আরাকান পৌছিব সেখানে তাঁর না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব।" "তা তো কল্লুম এখন ঔষধ সব গেল রোগীকে রক্ষা করব কি দিয়ে, দিনের বেলা যেমন একটা ধাক্কা এসেছিল সে রকম আর একটা ধাক্কা এলে তো কিছুতেই রক্ষাকর্ত্তে পারব না" "দেখুন ভগবানের নাম নিয়ে রাতটা যদি কোন রকমে নির্ব্বিঘ্নে কেটে যায়।" বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নীচে পোর্টহোল বন্ধ করাবার জন্য নামিয়া গেলেন। আমি বিমূঢ়ের ন্যায় ডেকের উপর বসিয়া রহিলাম—ঠিক যেন ভ্যাবাচাকা মারিয়া গিয়াছিলাম। কেবিনের ১০।১২ হাত তফাৎ আমি বসিয়া রহিয়াছি অথচ কেমন করিয়া যে সে এসে এত কাণ্ড করিয়া গেল আমি টেরও পাইলাম না তাহা আমার মাথায় আসিল না। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে "কি হয়েছে ডাক্তার বাবু—এত গোল কিসের" বলিয়া সালোয়া উপরে আসিল—আমি তাহাকে সব বলিলাম, শুনিতে শুনিতে তাহার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল" তাঁহলে কি হবে দাদাবাবুর যদি আবার অসুখ হয় তো কি করে বাঁচাবেন" বলিয়া উদ্বিগ্ন নেত্রে আকুল ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যার সেই স্তিমিত আলোকে—সেই ম্লান মূর্চ্ছাতুর জ্যোৎস্নায় সেই উদ্বিগ্ন মুখখানিতে যে ব্যাকুলতা ফুটাইয়া তুলিয়া ছিল তাহাকে নিরাশা পীড়নে আরও বাড়াইয়া দিবার মত নিষ্ঠুরতা আমাতে ছিল না তাই বলিলাম "ভয় কি আর ও ঢের ওষুধ আমার কাছে আছে" জানিতাম যদিও এটা একেবারে মিথ্যাকথা। ঔষধ আমার কাছে অবশ্য এক বাক্স ঠাসা ছিল কিন্তু তাহাতে যে প্রয়োজন হইলে

বৃদ্ধের প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইব না তাহা আমি উত্তমরূপে অবগত ছিলাম; কিন্তু তবুও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা যে কেন বলিলাম, তাহা বুঝিতেছ কি—নরকে যাইতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু সালোয়ার কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। গুরুহত্যা করিবার জন্য ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যদি তাঁহাকে কেবল নরক দেখাইয়াই অব্যাহতি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে একটী সুন্দরী, বিপদ গ্রস্থা নারীকে একটু বৃথা আশ্বাস দিয়া সুস্থ করার অপরাধে আমার আর কত দণ্ড হইবে!—"তা হলে বিশেষ কিছু হানি হয় নাই তো?" "হানি হইয়াছে বৈকি! সেগুলি সব ডাক্তার শঙ্কর লালের ঔষধ—সেগুলি হারাইবার দরুণ তিনি অন্ততঃ আমাকে অসাবধান ও দায়িত্ব-জ্ঞান হীন মনে করিবেন তো! "কি করিবেন বলুন—এতো আপনার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয় এর জন্য তিনি আপনাকে দোষী করিবেন না?" "দেখুন সেটা আমার বরাত! আর আপনার মত একজন উকীল আমার তরফে থাকতেও যদি মামলা হারি, তাহলে আমার খুবই দুরদৃষ্ট বলতে হবে, "আপনি কি আমার মক্কেল নাকি? তা কি রকম ফি দেবেন তাতো কিছু বলেন নি" "আচ্ছা মামলা তো ফতে করুণ—পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দিব।" "বেশ বেশ দেখা যাবে—এখন আমি উঠি আপনার জলখাবারটা পাঠিয়ে দি গে—আর রাত্রের দুটো খাওয়ার ও তো জোগাড় কর্ত্তে হবে।" "নিশ্চয় তার আর ভুল আছে—ঔষধই চুরি যাক্ আর যাইহোক, ওটা তো ভুলে যাবার জো নাই—বিশেষতঃ জলখাবারটা "সেটা তো ফাও—"অনেক সময় খরিদের চেয়ে তার ফাউ নিয়েই মারামারি হয়—ফাউটাই বেশী মিষ্টি," "ঈস্ বলিয়া মৃদু হাসিয়া

সালোয়া নীচে চলিয়া গেল—সে হাস্যে আনন্দ ও কৌতুক মিশামিশি হইয়া ভাসিতেছিল—কণ্ঠস্বরে যেন তৃপ্তি গলিয়া পড়িতেছিল—এই ছোট্ট "ঈস'টুকু যে সময় বিশেষে কত মধুর, কত কর্ণ-সুখকর হইতে পারে—তাহা অনির্ব্বচনীয়।

রাত্রে আহারাদির পর আর একবার বৃদ্ধকে দেখিয়া আসিলাম—অবস্থা অনেকটা ভাল দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম—সালোয়াকেও আজ একটু প্রফুল্ল দেখিলাম কিন্তু কি কারণে তাহা বুঝিলাম না। পোর্টহোল উত্তমরূপে বন্ধ আছে দেখিয়া সালোয়াকে কেবিন ভিতর হইতে বন্ধ রাখিতে বলিয়া উপরে আসিলাম। কাপ্তেন সাহেব ডিউটীতে বসিয়াছেন—আমায় দেখিয়া বলিলেন" "কি আজও রাত জাগবেন নাকি" আমার রাত্রি জাগরণে আজ তত স্পৃহা ছিল না কারণ নির্জ্জনে ভাবিবার মত কতকগুলি চিন্তা আমার মাথায় প্রবেশ করিয়াছিল—তাই জন্য বলিলাম "যদি আবশ্যক থাকে তো জাগিতে পারি, "না—না কিছু আবশ্যক নেই, আমি উপরে নীচে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছি।" একথা শুনিয়া আশ্বস্ত চিত্তে কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভোর হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল—আঁধারের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে তবে আলোকের রাজত্ব তখনও সুরু হয় নাই, পাখীরা কলরব করিতে আরম্ভ করে নাই তবে দূর হইতে অস্পষ্ট মানব কোলাহল

শ্রুত হইতেছিল—খুব একটা তীব্র বংশীধ্বনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চোখ মুছিতে মুছিতে ডেকের উপরে আসিলাম—দেখিলাম আমরা মনুষ্য রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি গত দুইদিন যেমন কেবল জল-কলরব ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাই নাই আজ তাহার একটু পরিবর্ত্তন হইবে, এই আশায় আনন্দিত হইলাম। দূর হইতে আরা-কানের জেটির নির্ব্বাণ-কল্প আলোক মিট্ মিট্ করিতেছিল—আমাদের জাহাজের মাল্লারা সব সারিবদ্ধ হইয়া ডেকের উপরে রেলিংএর ধারে দাঁড়াইল—সার্চ্চ লাইট্‌টা অনেক দূর হইতেই নড়িয়া চড়িয়া অদূরস্থ জেটীর রক্ষকবর্গকে আমাদের শুভাগমন জ্ঞাপন করিতেছিল—তারপর জাহাজ ক্রমশঃ গতি পরিবর্ত্তন করিয়া জেটীর নিকটে আসিতে লাগিল—কাপ্তেন তাঁহার জায়গায় দাঁড়াইয়া মস্তবড় একটা চাকার হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঘুরাইতেছিলেন; মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছিল এবং নীচে সারংএর ঘড়ীতে 'ফুল' 'হাফ' প্রভৃতি গতি সূচিত হইতেছিল—জাহাজ জেটীর কাছাকাছি আসিলে দেখিলাম জেটীর এক পার্শ্বে একটী ছোট লঞ্চ বাঁধা তাহাতে আলো জ্বলিতেছে অপর পার্শ্বে একটী বোট বাঁধা রহিয়াছে—তাহাতে একটা লোক বস্ত্রাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের জাহাজের মাল্লারা এবার খুব কোলাহল করিতে লাগিল দুইজন রেলিং টপকাইয়ে জাহাজের ডেকের সরু কিনারার উপর দাঁড়াইয়া বড় বড় দড়ি ছুঁড়িয়া দিল—জেটীর উপরের খালাসীরা সেই দড়ি জেটীর প্রান্তস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহকীলকে আবদ্ধ করিয়া টানিতে লাগিল—ক্রমশঃ জাহাজের নঙ্গরটী সমুদ্র-গর্ভে পতিত হইল। জাহাজটী যেন ক্রমশঃ স্থির হইতে লাগিল—জাহাজ থামিলে কাপ্তেন নামিয়া

পোর্ট অফিসে চলিয়া গেলেন—আমিও ইত্যবসরে নামিয়া জেটীর উপর একটু বেড়াইয়া লইবার অভিপ্রায়ে জেটীতে পদার্পন করিয়াছি এমন সময় কে যেন আমার স্কন্ধে হস্তার্পন করিল—পিছন ফিরিয়া দেখি—আগন্তুক, ডাঃ শঙ্করলাল—মৃদুহাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত অথচ বেশ সৌম্য, শান্ত। "কেমন শেখর কোন কষ্ট হয়নি ত" "আজ্ঞে না—" বলিয়া দ্বিতীয় কথা বলিবার আগেই তিনি বলিলেন—"চল ডেকে গিয়া সব শুনিব এখানে কোন কথা নয়।" তাঁহার অতীব সতর্কতা এই প্রথম লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার সঙ্গে ডেকের উপরে আসিলাম—ডেকের উপরে দুখানা চেয়ারে দুজনে বসিলাম—প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগীর অবস্থা কিরূপ" "আমি বলিলাম এখন ভালই—বরং পূর্ব্বেকার চেয়ে আরও ভাল" "বেশ বেশ বড় আনন্দিত হলেম—এখন দেখ্‌ছ শেখর, আমি অযোগ্য পাত্রে কার্য্য ভার দিই না" "আজ্ঞে; আমি আপনার সাহচর্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য" "যাক্‌ ঔষধ যাওয়াতে বিশেষ ক্ষতি নাই তোমার রোগীটীকে যে সুস্থ অবস্থায় এনেছ তাই আমার সৌভাগ্য—কাণা চীনাম্যানটী যে সঙ্গ নেবে তা আমি ধরেই নিয়েছিলুম—এত সাবধান হয়েও তাকে আমি হটাতে পার্চ্ছিনা ওটা অশিক্ষিত চীনাম্যান না হলে কোনকালে ও আমাকে হারিয়ে দিত—এই সময় সাঁ করিয়া কি একটা তাঁহার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল—একমুহূর্ত্ত মধ্যে সেটা ডাক্তার শঙ্করলালের পশ্চাতস্থ ষ্টীমারের চিমণীর গায়ে লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ডেকময় ছড়াইয়া পড়িল—আমি চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম—ডাক্তার শঙ্করলাল না ভীত না বিস্মিত এমন ভাবে উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমার চীৎকারে

জাহাজের মেট আলো লইয়া ছুটিয়া আসিলেন খালাসীরাও দৌড়িয়া আসিল—তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "কিছু না, তোমরা যাও।" সে গম্ভীর আদেশের প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও ছিল না—তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার শঙ্করলাল সেই ভগ্ন-খণ্ডগুলি কুড়াইয়া বলিলেন "ডাক্তার এটা একটা বল্লম—আমাকে বধ করিবার জন্য ছোঁড়া হয়েছিল—কিন্তু ভাগ্য আমার সহায়, তিনিই আমায় রক্ষা করিলেন।" ততক্ষণে ফরসা হইয়া গিয়াছিল, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি দূরে একখানা বোট স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে একব্যক্তি বসিয়া হাল ধরিয়া আছে আর বোটের মাঝে দাঁড়াইয়া একটা চীনাম্যান টুপি নাড়িতেছে—অনুমানে বুঝিলাম এ সেই কাণা চীনাম্যান—অপর কাহারও এত দুঃসাহস হইতে পারে না। ডাক্তারের নির্ভীকতা দেখিয়া আমি ভয়ে, বিস্ময়ে অবাক্ হইলাম। এই সময় কাপ্তেন ফিরিয়া আসিলেন—সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি ডাক্তার শঙ্করলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "যদি বলেন পোর্ট পুলিস ডাকাইয়া উহাদের পাছু লইয়া গ্রেপ্তার করি" "পাগল হয়েছ মহম্মদ—এ সকল ব্যাপারে পুলিস ডাকিয়া সময় নষ্ট করিতে আছে আমার যখন কোন অনিষ্ট হয় নাই, তখন আর হাঙ্গামায় কাজ নাই। আর এক হিসাবে এটা আমারই তো দোষ—আমিই তো অসাবধান ছিলাম—আমার শত্রু আমায় বারাবর অনুসরণ করিতেছে জানিয়াও আমি আত্মরক্ষায় যত্নবান হই নাই।" "আপনার মত লোকের ও শত্রু থাকে, তাহলে"—"পৃথিবীতে অজাতশত্রু কেহ নাই মহম্মদ,

মন্দলোকের শত্রু হয় ভাললোক, আর ভাললোকের শত্রু হয় মন্দলোক ; মোট কথা এই যে লোক যেমনই হউক না কেন তাহার শত্রু থাকিবেই ; আমাদের দেশের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছ।” “তা আর শুনি নাই তাঁর প্রথমভাগ পড়েই তো জ্ঞানের আরম্ভ।” এ হেন লোকেরও শত্রুর অভাব ছিল না—তখন আমরা তো অতি তুচ্ছ।” কাপ্তেন বলিলেন “আপনি তা হলে আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন “টেলিগ্রাম আর কি করে পাব সে তো তুমি কলকাতায় করেছ।” “আমি একটা বিপদের আশঙ্কা বরাবরই করে ছিলাম—তাই কাল ভোরে এখানে নেমে তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছিলাম, আমার একদিন আগে বেরবার উদ্দেশ্য যে ঐ চীনাম্যান আমার অনুসরণ করে আসবে, তাহলে তোমরা অনেকটা নিরাপদে আসতে পারবে—কারণ আমি ওর সঙ্গে বোঝা পড়া কর্ত্তে পারি—কিন্তু যখন দেখলুম ও আমার পাছু না নিয়ে রেঙ্গুনেই রইল তখনই বুঝলাম ও তোমাদের পাছু নিয়ে আস্‌বে, যদি তোমরা ওকে এঁটে উঠ্‌তে না পার তাহলে আমার এত পরিশ্রম এত যত্ন সব ব্যর্থ হবে, তাই ভেবে এখানে নেমে পড়লুম—পড়েই সুন্দরবনে আমার লাঞ্চ মালতীকে আন্‌তে বললুম—তুমি তাতে দুর্গাদাসবাবুকে ও সালোয়াকে তোলার বন্দোবস্ত কর—ডাক্তারেতে আমাতে একবার সহরটা ঘুরে আসি—একটু কড়া পাহারা রাখবে যদিও এখন আর খানিকক্ষণ বেশী ভয় নেই, কারণ এ রকম টানে উজন ঠেলে এদিকে আসতে তার ৮।১০ ঘণ্টা বিলম্ব হবে।—তবু ও সাবধানের মার নেই কি বল ডাক্তার?” বলিয়া একটু হাসিলেন—বাস্তবিক এত বিপদে এত স্থির ধীর থাকাটা যে কত

শক্ত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই—বিপদ—আর সে কেমন বিপদ, শিয়রে শমন বলিলেই চলে তবুও একটু চাঞ্চল্য—একটুও উদ্বেগ নাই, যেন কিছুই হয় নাই তাই শাস্ত্রকারেরা মহাপুরুষলক্ষণে বলিয়াছেন "বিপদি ধৈর্য্যম্" তা আজ সম্মুখে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া অনুভব করিলাম—পুলকিত হইলাম।

তোমার সঙ্গে লগেজ কি আছে?" "একটা পোর্টম্যাণ্ট একটা বেডিং আর একটা প্যাকিংকেসে ঔষধ ও যন্ত্রাদি আছে" "আচ্ছা, বেডিং আর ঐ কেসটা সঙ্গে নিতে হবে" খালাসীদের বল উপরে দিয়া আসিতে—আমরা সহর বেড়াইতে যাইব বেডিং ও ঔষধের পেটী কি কাজে লাগিবে বুঝিলাম না—জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা হইল না, মেট্‌কে খালাসী দিয়া ঐ দুটা জেটীতে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া তাঁহার সঙ্গে উপরে আসিয়া পৌঁছিলাম—তিনি গিয়া একটা গাড়োয়ানকে বর্ম্মীজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাবাবু এখানে বাঙালীদের থাক্‌বার হোটেল আছে জান" "হ্যাঁ বাবু চলুন না সেখানে পৌছাইয়াদি, কিন্তু দেড় টাকা ভাড়া লাগিবে" দর কসাকসি করিয়া পাঁচসিকা ভাড়ায় রফা করিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন আমি ও উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে তিনি একটা খড়খড়ি তুলিয়া বলিলেন ডাক্তার পেছনে কেউ আছে কি? আমি উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিলাম "একটা বর্ম্মা ছোঁড়া" তিনি হাসিয়া বলিলেন "হুঁ।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আরাকান রেঙ্গুনের চেয়ে অনেক ছোট সহর, বিশেষতঃ যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আরাকান এত সমৃদ্ধ হয় নাই। বহু রাস্তা অতিক্রম করিয়া গাড়ী যখন গলিতে ঢুকিল, তখন ডাক্তার শঙ্করলাল বলিলেন "ঐ যে বর্ম্মা ছোঁড়াটীকে দেখছ—উটি কে জান?" "না রাস্তার ছোঁড়াটোঁড়া হবে" "উহুঁ, উটী সিন্‌ফিউএর একটী চর, আমরা কোথায় যাইতেছি তাহার খবর লইবার জন্য পাছু লইয়াছে যাই হোক্ এবার আর ঠক্‌ছি না—এবার যদি ওদের ঠকিয়ে পালাতে পারি তা হলে এই পাছু নেওয়াটা বন্ধ হবে।" "আচ্ছা ও লোকটা আপনার এত শত্রুতা কর্চ্ছে কেন?" "সে অনেক কথা—সে সব এখন বলা সম্ভব নয়—ও আমাকে তিব্বত থেকে পেছু নিয়ে আসছে; আমি গত তিন বৎসর তিব্বতে ছিলাম—সেখানে অনেক কষ্টে লামার ছদ্মবেশে লামারদলে মিশে মানবজীবনের গুপ্ত রহস্য অনেকটা আবিষ্কার করে এনেছি—এই সম্বন্ধে একখানি খুব প্রাচীন পুঁথি একটা মঠ থেকে আমায় চুরি করে আন্‌তে হয়—ও সেই মঠের লামাদের চাকর, যদিও কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি কিন্তু তাতেও ছাড়ানছিড়েন নেই—ও বেটা সেখান থেকে পেছু নিয়ে এসেছে।" "তাহলে কি করবেন—এ রকম দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকা ও তো সুবিধা নয়" "না—ভয় কি তা আমি জানি না শেখর, ভয় যদি কর্ত্তুম তা হলে এ কাজে হাত দিবার আমি অযোগ্য হতুম—

ভয় কর্ব্বার কিছু নেই, তবে সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য।" গাড়ীটী আসিয়া একটা বাড়ীর সামনে থামিল—সামনে দরজায় টুলের উপর একটী পৈতাধারী বাঙ্গালী ভাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন—তিনি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আসুন, আসুন, ডাক্তারবাবু, অনেকদিন পরে দেখা, এবার বহুকাল আসেন নাই।" ব্রাহ্মণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চাকর ডাকিয়া আমাদের মোটঘাট তুলাইয়া লইলেন এবং পরম সমাদরে আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন—যাইবার সময় দেখিলাম সেই ছোঁড়াটা বাড়ীর সামনে ঘুরিতেছে; তাহাকে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভাঙাভাঙা বর্ম্মাভাষায় বলিলেন "কিরে মংপো কি চাই?" উত্তরে হি হি হি করিয়া একটা আহাম্মুখের মত হাসিয়া ছোকরা ছুটীয়া পলাইল। অনুমানে বুঝিলাম ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা নয়, ছোঁড়াটা আমাদের অনুসরণই করিয়াছিল। হোটেলের কর্ত্তার নাম শুনিলাম রসিকলাল চক্রবর্ত্তী—এখানে বাঙালী মহলে তিনি রসিকঠাকুর বলিয়া পরিচিত। সুদূর বাংলার বিষ্ণুপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া ইহাঁর আরাকান আগমনের একটা গুপ্ত কারণ ছিল সেটা অবশ্য খুব ভাল নহে। শুনা যায়, প্রথম যৌবনে তিনি পৈতৃক যজমানরক্ষা ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন—সেই উপলক্ষে বর্দ্ধমানে এক তন্তুবায় শিষ্যের বাড়ীতে শুভাগমন করতঃ গভীর রাত্রে শিষ্যের যুবতী বিধবাভগ্নী কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ও মুদ্রাসহ অর্থাৎ সোপকরণ অমান্ননৈবেদ্য সহ ভোঃ নমঃ করিয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত পুলিশের ভয়ে হেথাহোথা করিয়া অতিকষ্টে আরাকানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং অসার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মে মন দিয়াছেন—এখানে যজমানী বিদ্যার পরিচয় দিলে

পাছে আবার দুষ্টলোকে সন্দেহ করে—সেইজন্ত মূর্খব্রাহ্মণনন্দনের জাতীয় 'রন্ধন' বিদ্যা অবলম্বন করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন—জল-হাওয়ার গুণে সেই তন্তুবায়নন্দিনী এক্ষণে সাধারণের "মাতা-ঠাকুরাণী" রূপে পরম সমাদৃতা ছিলেন। এ গুহ্য ইতিহাস অনেকেরই অবিদিত ছিল না, তথাপি প্রবাসে পুরাতন কাসুন্দী নাড়া চাড়া করাটা বাঙ্গালীর স্বভাব সিদ্ধ নহে; কারণ সেখানে বাংলার 'সমাজ' নামক সেই শতপদ বৃশ্চিকের অস্তিত্ব ছিল না। আরও একটা প্রবল কারণ রসিক ঠাকুরের স্বপক্ষে ছিল—সেটী তাহার স্বভাব-সিদ্ধ মধুর আপ্যায়ন—সকলের সহিত সুখে দুঃখে সহানুভূতি। সেইজন্য আরাকান প্রবাসী বাঙালী মাত্রই তাঁহাকে স্নেহে কৌতুকে 'ঠাকুর দা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। আমরাও তাঁহার প্রচুর আদর যত্ন উপভোগ করিয়াছিলাম—কারণ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার শঙ্করলালের বিশেষ পরিচিত এবং তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত ছিলেন। আমরা আহারাদি করিয়া হোটেলের পেছনের একটা ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা করিতেছিলাম—চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারদেশে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন—ডাক্তার বলিলেন "দেখ ঠাকুরদা—আমরা এখনি একটা কাজে রওনা হইব—এই বাক্সটাক্স যা রইল এ সব কোন ষ্টীমারে কলিকাতায় বুক্ করে দেবে—আর রসিদটা কলিকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে—আর যদি কেউ কোন লোক বর্ম্মীজ কি চীনাম্যান, যদি আমাদের খোঁজ কর্ত্তে আসে বলবে আজ আমরা রেঙ্গুনে রওয়ানা হয়েছি। "এই বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য ও খরচা বাবদে কিছু টাকা দিয়া আমায় বলিলেন "চল শেখর—সামনের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পেছনের এই বাগানের

মধ্যে দিয়ে যাই, ছাওয়ায় ছাওয়ায় বেশ যাওয়া যাবে।" অবশ্য ছাওয়ায় ছাওয়ায় যাওয়ার অর্থ আমার অবিদিত ছিল না—আমি ঈষদ্ধাস্যে বলিলাম,"চলুন"—আমরা উভয়ে সেই বাগানের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাগান পার হইয়া পথটী ক্রমশঃ সরু হইতে লাগিল এবং বৃক্ষশ্রেণীর বাহুল্য দেখিতে পাইলাম—খুব দূরে একটী প্যাগোডার স্বর্ণচূড়া রৌদ্রে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল, পথটী ক্রমশঃই অপ্রশস্ত হইয়া গভীর বনের উপকণ্ঠে যেন মিলাইয়া গেল; তারপর হাত দিয়া গাছপালা ঠেলিয়া অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম—ক্রমশঃ আলোক ও ম্লান হইয়া অন্ধকারে পরিণত হইল—দিবা দ্বিপ্রহরে অরণ্যমধ্যে যে এত অন্ধকার জমাট হইয়া থাকিতে পারে, তাহা আমার জ্ঞানের অগম্য ছিল। যাইবার ক্রমশঃই অসুবিধা হইতে লাগিল, কাঁটাগাছের ডালে জামা কাপড় আটকাইয়া যাইতে লাগিল, ডাক্তার বলিলেন "বড় কষ্ট হচ্ছে না শেখর। এমন জান্‌লে এ পথটায় আসতাম না, তিন বৎসরের মধ্যে এসব জায়গা যে এত বন হয়ে গেছে, তা মনে কর্ত্তে পারিনি—তিন বৎসর আগে আমি এই পথেই তিব্বত গিয়েছিলাম। তবে আর বেশী দূর নয়, আমরা প্রায় এসে পৌঁছিলাম।" আমরা যে কোথায় যাইতেছিলাম, তাহার কোন ধারণাই আমার ছিল না; সুতরাং আমি একটী সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' বলিয়া নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পর একটা অস্ফুট কলধ্বনি কর্ণগোচর হইলাম—প্রবলবৃষ্টির পর রাস্তার ধারে নালাগুলি ভরিয়া উঠিলে যেমন জলরাশির একটা মৃদু মৃদু ধ্বনি শুনা যায়—অনেকটা সেই রকম—যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলাম অমনি ঐ ধ্বনি ক্রমশঃ গুরু গম্ভীরনিনাদে দিক্ মুখরিত করিতে

লাগিল—দেখিলাম একটা খুব চওড়া নদীর ধারে আমরা উভয়ে দণ্ডায়মান—আর নদীর খানিক দূরে একখানি ষ্টীম লঞ্চ বাঁধা রহিয়াছে—নদীটীর অপর পারের শ্রেণী অস্পষ্টবৎ প্রতীয়মান।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নদীতীরে দাঁড়াইয়া ডাক্তার একটী ক্ষুদ্র বংশীধ্বনি করিলেন দূরস্থিত লঞ্চ হইতে আর একটী বংশীধ্বনি তাহার প্রত্যুত্তর দিল। তিনি যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "শেখর—এই বার বোধ হয় সেই হতভাগা চীনেম্যানের হাতথেকে নিষ্কৃতি পেলাম ; এবারে আর আমার পাছে ধাওয়া কর্ত্তে পারবে না।" পরক্ষণেই দেখিলাম একখানি ছোট বোট সেই উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে, বোট আসিলে আমরা তাহাতে অতি কষ্টে আরোহণ করিলাম—কারণ নদীর পাড়টা ভারি চড়া ছিল, নামিতে উভয়েরই খুব কষ্টবোধ হইয়াছিল—যাইহোক কোনরূপে বোটে চড়িয়া শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম—যেরকম ঢেউএর বহর দেখিলাম, তাহাতে যে নিরাপদে লঞ্চে গিয়া উঠিতে পারি, সেরকম ভরসা অল্পই ছিল—আমার এই আশঙ্কা বোধ হয় মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ডাক্তার শঙ্করলাল সেটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ভয় পেয়েছ শেখর, সাঁতার জান তো" আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কহিলাম—"এটা কি সমুদ্র ?" "না এটা ঠিক সমুদ্র নয়, এটা একটা তারির offshoot ; বাঙ্গালায় এগুলোকে

খাঁড়ি বলে—সমুদ্র থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরে আবার সুন্দর বনের মুখে সমুদ্রের সঙ্গে মিলেছে—এটা হচ্ছে তাহার মোহানা—এখানটা তাই খুব চওড়া দেখাচ্ছে; তবে এটা আগে গিয়া খুব সরু হয়ে একটী ছোট নদীর মত হয়ে গিয়েছে—এর ভেতর বড় জাহাজ বা ষ্টীমার যাবার মত রাস্তা নাই তবে নৌকা, লঞ্চ এসব, চলে—তবে যেরকম ভরে আস্‌ছে, ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে এটা চড়া হয়ে যাবে আর এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাক্‌বে না” “আমরা কি এখন লঞ্চ করেই বরাবর কলিকাতা যাইব?” “না—উপস্থিত কলিকাতায় না গিয়া আমি সুন্দরবনেই উঠিব, সেখানেও আমার একটা আস্তানা আছে, সেই খানেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সমস্যার সমাধান কর্ব্বো—যদি পারি তো অসাধ্য সাধন হবে, আর যদি না পারি তবে আমার জীবনের এই শেষ উদ্যম জেনো” কথাগুলি এমন ঐকান্তিকতার সহিত বলিলেন, যে আশানিরাশার প্রবল দন্দ্ব হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ হইতেছিল—তাহার একটা আর্ত্তস্বর যেন তাহাতে জাগ্রত ছিল। ততক্ষণে আমরা লঞ্চের কাছে আসিলাম—লাঞ্চ হইতে একটা ছোট সিঁড়ি বোটে নামাইয়া দেওয়া হইলে আমরা লাঞ্চে আরোহণ করিলাম, লাঞ্চ ছাড়িয়া দিল—বোটখানি আরাকান বন্দরের দিকে ফিরিয়া গেল। লাঞ্চ-খানি খুব ছোট নয়—ভিতরে একটী কেবিন রহিয়াছে তাহার দরজায় ঘোর সবুজ রংএর পর্দ্দা ফেলা, বুঝিলাম বৃদ্ধ ও তাহার নাতিনী ইহার মধ্যে আছেন; আর তাহার সামনে দুখানি কৌচপাতা তাহার এক খানিতে ডাক্তার শঙ্করলাল বসিলেন—অপর খানি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি বসিয়া একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক লইয়া পাতা উল্টাইতে

লাগিলেন। ততক্ষণ অপরাহ্ণ হইয়াছিল—সূর্য্যরশ্মির তীব্রতা অনেকটা কমিয়া গেলেও—তাহার উজ্জ্বলতা বিশেষ কমে নাই। খাঁড়ির নীলজলের তরঙ্গাবর্ত্তে পড়িয়া সে যেন বিক্ষোভিত সিন্ধুর মত হাত পা মেলিয়া খেলা করিতেছিল—লাঞ্চের জানালাগুলিতে পর্দ্দা দেওয়া ছিল—আমি, আমার দিকের পর্দ্দা খুলিয়া তীরস্থ অরণ্যানীর শোভা দেখিতে ছিলাম, সেই জলস্রোত কেমন করিয়া প্রশস্ত মুখ হইতে ক্ষীণায়তন হইতেছিল তাহা বেশ লক্ষ্য করিলাম। তীরস্থ বৃক্ষ গুল্মগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল—এমন কি অরণ্যসঞ্চারী পক্ষীগণের কলধ্বনি ও স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ডাক্তার শঙ্করলাল তখনও নিবিষ্ট মনে অধ্যয়নে রত ছিলেন—হঠাৎ দেখিলে মনে হইত যেন ধ্যানরত ঋষি। বাস্তবিক সেই সন্ধ্যায়, সেই ম্লান ধূসর আলোকে এই দীর্ঘকায় মহাপুরুষের ছবি এখনও যেন আমরা নেত্রপটে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। সে রকম মনুষ্য আর আমি জীবন দেখি নাই—আর হতভাগ্য বঙ্গদেশ সেরূপ দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সবল, সুশ্রী, সুষ্ঠু সন্তানের জননী হইয়া গৌরবান্বিতা মনে করিবেন, এ ভরসা আর হয় না। দিনের দিন আমরা যেন ক্ষুদ্র, খর্ব্ব, দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছি। বুড়া বয়সে সেদিন একজন ডাক্তারের "ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি" বলিয়া একখানা চটী বই পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসিয়াছিল—একবার মনে হইল যদি ডাক্তার শঙ্করলালকে এখন ফিরাইয়া পাইতাম তো দেখাইতাম, সত্যই প্রকৃতমনুষ্যপদবাচ্য বাঙ্গালী এককালে এদেশে জন্মাইয়াছিল—শান্তিপুরের যষ্টি-ক্রীড়া বিশারদ গোপনন্দনেরা আজ কোথায়! কোথায় দস্যু সর্দ্দার বিশ্বনাথ, কোথায় দুর্দ্দম্য দস্যু কালুরায়—পুরাতন

বাংলার মনুষ্যত্বের ধ্বংসাবশেষ! তোমরা লোপ পাইয়া বাঙালীর মুখে যে কালিমার ছাপ পড়িয়াছে, তাহা তাহাদের নামের পশ্চাদভাগে B. A., M. A., P. R. S., P. H. D., প্রভৃতি শূন্যগর্ভ উপাধি মালায় দূর করিতে পারিবে না। ডাক্তার শঙ্করলাল সেইরূপ সেকেলে আড়ার মানুষ ছিলেন। দাঁড়াইলে উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুটের কম হইতেন না, হস্তপদ সমস্ত বলিষ্ঠ সুশ্রী ও সুশোভন—মুখখানি বাদামী, দাড়ীর দিকে সরু প্রকাণ্ড বিস্তৃত ললাট চক্ষুদুটী বৃহৎ উজ্জ্বল আর খরতীক্ষ্ণদৃষ্টিশক্তিশালী নাসিকাটী "তিল ফুল জিনি" না হইলেও বেশ মানান সই মাথার কেশগুলি এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও কাঁচা ছিল—আমার অনুমান তখন তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের ন্যূন নহে—খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, তিনি শিখা ধারণ করিতেন না, তবে গলদেশে উপবীত ছিল। শরীরে অসীম শক্তি, প্রচুর সামর্থ্য ছিল; আমার মত পঞ্চ'বংশতিবর্ষীয় যুবকাপেক্ষা তাঁহার মানসিক ও শারীরিক দৃঢ়তা অনেক বেশী ছিল। আর জ্ঞান—তাহার তুলনা করা আমার মত অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম নয়। এই হচ্ছে আমাদের সেকেলে ওল্ড ফুলের নমুনা—আজ সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে যৌবনে-বৃদ্ধ, চির-ডিস্পেপসিয়াগ্রস্থ বাবুরা যাঁদের নাম করতে ঘৃণা বোধ করেন। সভ্যতার সভ্য জিনিষটুকু আমরা নিতে পারি নাই—লইয়াছি তার উপরস্থ আবরণ, আর সেই অনাচারের চাকচিক্যশালী আবরণে নিজে-দের আবৃত করে, মদান্ধ হয়ে আমরা দূর করে ফেলে দিয়েছি, আমাদের স্বাস্থ্য—সরলতা, সত্যবাদিতা, পরদুঃখানুভবতা—এক কথায় আমাদের যা কিছু ছিল সব। এখনও সাবেক যে কাটামোটুকু অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটুকু আবার বৃথা হিংসা দ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা

শূন্য-আত্মাভিমান আর অর্থ লালসার কীট-দংশনে, এমন জীর্ণ হয়েছে যে সত্যই তার সংস্কারের আবশ্যক—কিন্তু সংস্কারকরূপে যে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা সেটুকু ফেলে দিয়ে একেবারে ঢেলে সাজাত চান্—কিন্তু জানেন না যে তাঁদের গড়বার ক্ষমতা মোটেই নেই—ভাঙ্গতে অবশ্য চেষ্টা কল্লে পারেন; কিন্তু ভেঙ্গে ফেলে গড়বার সময় টের পাবেন, যে সত্যই তাঁরা কত অক্ষম—কত হীন—কত শূন্য-আস্ফালনকারী।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিল—যখন পুঁথির লেখাগুলি আর চর্ম্ম-চক্ষে দেখিবার কোন উপায় রহিল না, তখন পুঁথি বন্ধ করিয়া ঘাড় তুলিয়া শঙ্করলাল বলিলেন "শেখর তুমি ভেতর গিয়ে দুর্গাদাসবাবুকে দেখে এস, আর কিছু জল খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ একটু ভগবান্‌কে স্মরণ করি" বলিয়া পর্দ্দা তুলিয়া সেই ফাঁকের মধ্য হইতে হাত বাড়াইয়া ঋাঁড়ি হইতে জল তুলিয়া মুখ হাত ধুইয়া চক্ষু বুজিয়া ধ্যানরত হইলেন—মন্ত্রোচ্চারণের ঘটা বা বস্ত্রপরিবর্ত্তনাদির কোন আড়ম্বর দেখিলাম না। এরকম দেবারধনায় দেবতা সন্তুষ্ট হন কিনা জানি না, তবে সাধারণ লোকে হয়ত এরূপ পছন্দ করিবে না—সেইজন্যই বোধ হয় হিন্দুর পূজা-পদ্ধতিতে একটু বাহ্যাড়ম্বর আছে—সেটা দোষের কি গুণের সে বিচার করিবার স্থল এ নহে; তবে যাহাদের জ্ঞান অল্প ও সীমাবদ্ধ তাহাদের পক্ষে সেই অসীম অনন্তকে চক্ষু বুজিয়া ধ্যানে পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধহয় তাহাকে ছোট আকারে ধরা-ছোঁয়ার মত করিয়া পূজার ব্যবস্থা। ছোট ছোট মেয়েরা যখন খেলা করে, তখন তারা খেলা ঘরের হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া রাঁধুবাড়ু খেলে, তবে তারা বড় হয়ে সংসার মাথায় নিতে পারে।

ছেলেবেলায় যদি তাদের খেল্‌তে না দিয়ে কেবল পুস্তকে রাঁধা-পড়ার উপদেশ পাঠ করান হইত, তো তাহার বড় হইয়া মাছের ঝোল রাঁধিবার প্রণালীটা মুখস্থ বলিতে পারিলেও রাঁধিয়া ভাত দিতে পারিত না। সাকার পূজা জ্ঞানীর পক্ষে অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু যিনি সত্যই জ্ঞানী তাঁর কাছে হেয় নহে, সৌধ শিখরে আরোহণের একটী ক্ষুদ্র সোপান মাত্র। যাঁরা এর বিরুদ্ধে অহরহ যুদ্ধ ঘোষণা করে বৃথা নিজেদের সময় ও অন্ধ বিশ্বাসী ভক্তের ভক্তির অযথা ব্যাঘাত উৎপাদন করেন, তাঁরা সত্যই অজ্ঞ, কৃপার পাত্র। তাঁরা মনে করেন 'আমি মহাজ্ঞানী, আমার এক দেশবাসীকে অন্ধ দেখে আমি যদি তাকে জ্ঞানালোক প্রদান না করি তো আমার কর্ত্তব্য করা হবে না;" কিন্তু বাস্তবিক যদি তাঁর মনের অন্ধ তমসা বিদূরিত হইয়া থাকিত, তিনি ভাবিতেন—আমার নিরাকার ঈশ্বরকে আমি যেমন ভালবাসি ও ওর সাকার দেবতাকে তেমনিই ভালবাসে।" যে ঈশ্বর-বিদ্বেষী তাহাকে বুঝাইয়া, ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করাইয়া তাহার হৃদয়ে ভক্তি বীজ উপ্ত করিয়া দিলে—সত্যই জগতের, দেশের, সমাজের উপকার হয়; কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁদের কৈ?—যাঁরা কেবল ধর্ম্ম-কলহ-পটু, তাঁরা সংসারের সত্যই কোন উপকার করিতে পারেন না।

পর্দ্দা ঠেলিয়া কেবিনে ঢুকিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ তখন জাগ্রত—অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে পৌত্রীর সহিত কি বলিতেছিলেন—আমায় দেখিয়া অনেক কষ্টে যেন চোখ দুটী তুলিয়া চাহিলেন—আঁখি-তারা দুটী যেন একটু নড়িল—কি অভিপ্রায় যে জ্ঞাপন করিতে চাহেন, তাহা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। সালোয়া কিন্তু বুঝিয়াছিল, নতুবা মুখে টিপি টিপি

হাসি ফুটিতে ছিল কেন ; যে কথার সঙ্গে এত হাসি জড়ান আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে কিন্তু আমার ভরসা হইল না। আমি তাঁহার কাছে বসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—দেখিলাম নাড়ী অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও কিঞ্চিৎ সবল, তবুও জীবনের আশা আমি করিতে পারিলাম না। হাতটী যখন ধীরে ধীরে নামাইয়া দিতে যাইতেছি এমন সময় তিনি হাতটী অনেক কষ্টে যেন আমার মাথার উপর রাখিলেন—বাক্‌শক্তিহীন বৃদ্ধের অন্তরাত্মা, কি আশীর্ব্বাদে যে এ তুচ্ছদেহ পবিত্র করিলেন জানি না —কিন্তু মনে একটা বিপুল আনন্দ উপলব্ধি করিলাম। সালোয়া দূরে বসিয়া তখনও মিটি মিটি হাসিতেছিল—তাহার হাসিতে আমার গা যেন জ্বালা করিতেছিল—মনে ভাবিলাম, বাঙালীর মেয়ে, বর্ম্মায় আসিয়া পিতামহের আদরে প্রচুর স্বাধীনতা পাইয়া, এত প্রগ্‌লভা হইয়াছিল। যাহাই হোক্ যখন সেই হাস্যাননা গাত্রদাহ-কারিণী একথালা জলখাবার সামনে ধরিয়া দিল, তখন সে উত্তাপ অনেকটা দূরীভূত হইল। উদর জ্বলিলে বাঙালীর সর্ব্বাঙ্গই যে জ্বলিয়া উঠে তাহা একালের বাবুদের বুঝিবার শক্তি নাই—একটী সন্দেশ ও এক গ্লাস জল খাইয়া যাঁহারা আইঢাই করেন তাঁহাদের উদর নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত কাহিনী বুঝান সত্যই বিড়ম্বনা। ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে বাহিরে আসিয়া খাঁড়ির চন্দ্রালোকিত ধীর-প্রবাহমান জল-স্রোতের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তৎপর দিন বেলা আন্দাজ ৮টার সময় সুন্দরবনের মুখে আসিলাম —লাঞ্চ তীরে ভিড়াইবার মত সুবিধাজনক জায়গা দুষ্প্রাপ্য দেখিলাম; অথচ এখানে ডিঙি বা নৌকা পাইবার আশাও কম। এখন কি করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইব—সে একটা দারুণ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। দূরে তীরে দুইখানি পাল্কী ও কয়েকজন বাহক অপেক্ষা করিতেছে, দেখিলাম। লঞ্চের চালক জল মাপিয়া মাপিয়া ধীরে ধীরে লঞ্চ চালাইতে লাগিলেন; অনেক অন্বেষণের পর তীর হইতে ৪।৫ হাত দূরে লঞ্চ দাঁড়াইবার মত গভীর জল পাওয়া গেল। কিন্তু এই পাঁচ হাত জল কি করিয়া পার হওয়া যায়? নিজেরা হইলে না হয় সন্তরণ অবলম্বনে কার্য্যোদ্ধার করিতাম, কিন্তু সঙ্গে বৃদ্ধ রোগী—আবার ততোধিক অসুবিধা-জনক "নারী" রহিয়াছেন। "আমারই যেন কত দায়" এমন ভাবে আমি ছটফট্ করিতেছিলাম কিন্তু সত্যই যাহার দায় তাহাকে তো বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইতে দেখিলাম না—লঞ্চ লোঙ্গর করা হইলে তিনি তীরস্থ বেহারাদের ডাকিয়া বলিলেন কুঠী থেকে আট-হাত লম্বা একহাত চওড়া দেখে একখানা তক্তা আনিতে। তক্তা আসিলে উহার এক প্রান্ত ষ্টীমারে সংলগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত তীরে প্রোথিত করা হইলে পাল্কী লঞ্চের উপর আসিল, তাহাতে খুব সন্তর্পনের সহিত বৃদ্ধকে শয্যাসমেত স্থানান্তরিত করা হইল; পাল্কী ধীরে ধীরে তীরে উঠিল—এইরূপে দুখানি পাল্কী উঠিলে আমরাও শেষে তীরে উঠিলাম।

ডাক্তার শঙ্করলাল সঙ্গে সঙ্গে রোগীর উত্তরণের সুবন্দোবস্ত করিতে গেলেন, আমায় পিছনের পাল্কীর পাহারাওলা হইয়া যাইতে হইল— পাল্কীর অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার দিয়া একখানি সলজ্জ সুন্দর মুখ দেখা যাইতে-ছিল—মুখের অধিকারিণী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কি পাল্কীতে কাঁধ দিবেন নাকি?" আমি বলিলাম "সময় হইলে কাঁধ দিতে হবে বৈকি?" মুখের মত জবাব পাইলে সকলেই সন্তুষ্ট হয়, অগত্যা নির্লজ্জা নীরব হইল।

এ সেই ভীষণ সুন্দরবন—বঙ্গের গৌরব সামগ্রী, বঙ্গবাসীকে অতল জলের প্রীতি-উপহার। শ্বাপদ-সরীসৃপ-সঙ্কুল ব্যাঘ্র-গর্জ্জননিনাদিত, ঘন তরুচ্ছায়াচ্ছাদিত আলোক-দুর্ভেদ্য ভীষণ অরণ্য—যে সুন্দরবন পুরা-কালে দস্যু তস্করের আবাসভূমি ছিল—যে সুন্দরবনে প্রতাপাদিত্যের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ বিস্তৃত ছিল—যে সুন্দরবনে দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গি-মগজলদস্যুর লুণ্ঠনজাত ধনের গুপ্তভাণ্ডার ছিল, এ সেই সুন্দরবন—যে সুন্দরবন ভীষণ-সুন্দর ব্যাঘ্রের জন্মভূমি—কলিকাতার সার্কাসে নখদন্তহীন, অন্তঃসার-উদর, কঙ্কালরূপী যে ব্যাঘ্র দেখেন—যাহা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া কেবল পদাহত কুক্কুরের ন্যায় মৃদু আর্ত্তনাদে দর্শকবৃন্দের প্রীতিউৎপাদন ও সার্কাস অধ্যক্ষের অর্থোপার্জ্জনের সাহায্য করে, সে ব্যাঘ্র নহে—যে ব্যাঘ্রের কথা বলিতেছি তাহা কলিকাতার চিড়িয়াখানায় থাকে না— এই ঘনান্ধকার-পরিব্যাপ্ত অরণ্যে সুন্দরবনের সুন্দর একটী ব্যাঘ্রের ভীষণ চক্ষুর সম্মুখে না দাঁড়াইলে তাহার ধারণা করা সম্ভব নহে। এক মাইল দূর হইতে যে ব্যাঘ্রের লীলাধ্বনি কামান গর্জ্জনের ন্যায় অনুভূত হয়, সে ব্যাঘ্র আজকাল আর নাই—সেকালের মানুষের মত সেকালের

বাঘও দুর্ল্লভ হইয়া গিয়াছে; তবে এইখানে দুইমাস বাসকালীন, দূর হইতে দু'একটা বাঘ যাহা দেখিয়াছি—বনের মাঝে স্বাধীন ভাবে, মদোদ্ধত ভাবে, দু'একটা বাঘের যে স্বচ্ছন্দ পাদচারণা দেখিয়াছি—তাহা মনে হইলেও আজ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—এ অতিরঞ্জন নহে, প্রত্যক্ষ। বাঙলার অতীত ইতিহাসের কত গুপ্তকাহিনী, কত বামাচারী কাপালিকের পৈশাচিক তাণ্ডব লীলার গুপ্ত চিহ্ন, কত কালকবলিত ভগ্নমন্দির, কত প্রাসাদোপম অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ, কত সমুদ্রগর্ভকবলিত রণতরী, কত লাঞ্ছিতের আর্ত্তনাদ, কত দস্যুপীড়িতা রমণীর সতীত্বগর্ব্বোদ্ভাসিত পুণ্য কথা বক্ষে ধরিয়া শস্য-শামলা কানন-কুন্তলা বঙ্গভূমির পাদপ্রান্তস্থ এই পবিত্র অথচ ভয়ঙ্কর যে অরণ্য বিরাজিত তাহার সম্যক্ বর্ণনায় আমি অক্ষম—কল্পনাকুশলী পাঠক কল্পনার সাহায্যে তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। সে ক্ষমতা আমার নাই—অথচ প্রাংশুজনলভ্য ফলগ্রহণেচ্ছু উদ্বাহু বামনের মত এই দুরাশা আমায় সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিয়াছে। আমার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া—শৈশবের একটা ঘটনা মনে পড়িল; তখন আমরা মাইনর স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি—একবার পরীক্ষায় "গাভী"র সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়। আমার জনৈক সতীর্থ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিয়াছিল "গরু না থাকিলে আমাদের বড়ই বিপদ হইত কারণ মুচীরা তাহা হইলে জুতা সেলাই করিবার মোম রাখিত কিসের শৃঙ্গে—তাই গরুকে আমরা পূজা করি।" এতবড় গবেষণাত্মক রচনার পুরস্কারে হেড্‌পণ্ডিতের প্রবল বেত্রাঘাত পাইয়া অভিমানে সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। একালের দিনে হইলে এরকম thesis ইংরাজী করিয়া লিখিয়া দিলে প্রেমচাঁদ

রায়চাঁদ বৃত্তির অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ মিলা অসম্ভব হইত না। আমার সুন্দরবন বর্ণনা প্রয়াস অনেকটা আমার এই সতীর্থের মত হইল, উদারহৃদয় পাঠক পাঠিকা ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

খানিকটা দূর অগ্রসর হইতেই ডাক্তার শঙ্করলাল অদূরস্থ একটী ভগ্নস্তুপবৎ পদার্থের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "শেখর ঐ দেখ আমার সাধন কুটীর—যদি এ সাধনা সিদ্ধ হয় তবে জানিবে ঐ আমার স্বর্গ।" আমি কি স্বর্গ কি কুটীর কিছুই দেখিতে না পাইয়া নীরবে চলিলাম—নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম—সে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সম্মুখের কিয়দংশ পতিত ও স্খলিত অবস্থায় থাকিলেও ভিতরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এমন-কি তাহাতে মনুষ্যবাস চিহ্ন দেখিতে পাইলাম—এই নির্জ্জনে, ব্যাঘ্রসঙ্কুলস্থানে, তাহাদের প্রতিবাসী রূপে লোকে কি করিয়া বাস করে বুঝিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা ফটকের মধ্যে দিয়া পাল্কী দুখানি ও তৎপশ্চাৎ আমরা প্রবেশ করিলাম—বাড়ীটা খুব প্রকাণ্ড তবে একতালা। সেকালের সাতমহল বাটী, প্রথম তিনটা মহলে কেবল ভগ্নস্তুপ, চতুর্থ মহলটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সেখানেই আমাদের আস্তানা হইল—এক সারিতে চারিখানি বড় বড় ঘর তাহার দুইপ্রান্তে আরও দুই খানি ঘর তৃতীয় মহাল্লার সংলগ্ন; সম্মুখে খানিকটা খোলা উঠান, তাহাতে একটী গাভী আবদ্ধ রহিয়াছে, পার্শ্বে একটী হৃষ্টপুষ্ট শাবক মনের আনন্দে নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতেছে। ঘর-গুলি সব দোহারা এবং টানা ঘেরা দালান দিয়া ঢাকা; ছাদের উপর ছোট বড় মাঝারি নানারকম অশ্বত্থ বট ও অন্যান্য বন্যবৃক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে; এমন কি ছাদ ভেদ করিয়া ভিতরেও সরু সরু শিকড়

মাকড়সার জালের ন্যায় ছাদ ও দেয়াল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাটীটি দক্ষিণ দ্বারী—পূর্ব্ব প্রান্তের ঘর খানির অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ, তবে সেখান হইতে অল্প বিস্তর ধূম্র নির্গত হইতেছে দেখিয়া বুঝিলাম, উহা সর্ব্বতীর্থ সার—রন্ধনশালা। পশ্চিম দিকের কক্ষটী খুব সুসজ্জিত ও অনেকটা উন্নত অবস্থায় আছে, দেয়ালগুলি সবে পঙ্কের কাজকরা—এমন কি ভিত্তিগুলি যে পুরাকালে সুসজ্জিত ও বিচিত্রিত ছিল তাহার অস্পষ্ট অঙ্কণ এখনও বিদ্যমান। এই ঘরই বৃদ্ধ রোগীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপরবর্ত্তী কক্ষটী আমার ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল—তৎপরের কক্ষ ডাক্তার শঙ্করলালের—তৎপরস্থ কক্ষ আবদ্ধ এবং সর্ব্বশেষের একটী কক্ষ সালোয়ার জন্য সাজান ছিল। এই মহালের পরের অন্যান্য মহাল গুলি ভগ্নদশাগ্রস্থ, কোন ঘরের অর্দ্ধেক খসিয়া গিয়া—সেই ধ্বংসাবশের উপর একটী বিরাটাকৃতি মহীরুহ সগর্ব্বে উন্নত হইয়া কাল-মাহাত্ম্য ও ধ্বংসলীলা প্রকটিত করিতেছে; কোন মহলের ছাদটা ছাড়িয়া গিয়া খাঁ খাঁ করিয়া বিরাট দৈন্যের সূচনা করিতেছে, আবার কোন মহল বদ্ধাবস্থাতেই বল্মীকগ্রস্থ হইয়া পেচকাদি নিশাচরের আশ্রয়স্থল হইয়া আছে। আমরা একটু গুছাইয়া লইলে—ডাক্তার শঙ্করলাল পাল্কী দুই খানি বাহকসহ লক্ষ্ণৌ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; বুঝিলাম অনর্থক লটবহর বাড়ান বা বাজে লোকজন কাছে রাখিয়া গোলমাল করা তাঁহার অভীপ্সিত নহে। রহিবার মধ্যে রহিলেন সেই বীরবংশাবতংস মিশ্রনন্দন—তবে তাঁহার মুখ-ভাব দেখিলে বাস্তবিক দয়া হইত—অথচ ডাক্তার শঙ্করলালকে সে চিনিত, তাহার মুখের উপর কিছু বলিবার ভরসা তাহার ছিল না—

এই পাচক প্রবরের মুখ দেখিলেই এক লাইন কবিতা মনে হইত "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।" এখানি আসিয়া আর দুইটী অপরূপ মনুষ্যের সহিত পরিচয় হইয়াছিল—সে দুইটী ডাক্তারের পরমভক্ত, ঘোর অনুরক্ত, এই ভগ্ন অট্টালিকার রক্ষক, ভৃত্য চৈতন্যচরণ ও তাহার স্ত্রী; বাস্তবিক চৈতন্যের মত ভৃত্য একালে দেখি নাই—"সেবকায় পুরাতনঃ" এ নীতিবাক্যের মাহাত্ম্য তাহাতেই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। আজকাল পুরাতন ঝি-চাকর দুর্লভ। বাঙালীর ঘরে গোয়ালা কৈবর্ত্তের ছেলেরা বাঙালীর চাক্‌রি করিতে লজ্জা বোধ করে। তাহারা আজকাল কলকারখানায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া যাহা উপায় করে, তাহাতে জুতাজামা পরিয়া ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাবুয়ানা করে—কতক সিগারেট খায়, আর বাকী মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়—পেটে খাইবার মত কিছু বাঁচে না; কাজেই অনশনে অর্দ্ধাশনে প্লীহা যকৃৎ-বিকৃতিতে অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; আর রাখিয়া যায় প্রচুর দেনা এবং দুএকটী রুগ্ন দুর্ব্বল সন্তান—তবু তো তাহারা সভ্য, তাহারা বাবু হইয়াছে তো—আবার এই উন্নতি বাড়াইবার জন্য ক্ষীণদৃষ্টি সমাজ-সংস্কারক সোণার চশমাখানির ভেতর হইতে চাহিয়া বলেন—"নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত কর! নইলে হিন্দু! ভারত উদ্ধার তোমার কর্ম্ম নয়" উন্নত করার মানেটা তো আজও আমার কাছে হেঁয়ালীর মত বোধ হয়—দুপাতা পড়িলেই কি উন্নত হয়! জাতিভেদ উঠিলেই কি উন্নত হয়। দুপাতা পড়িলেই তো দেখি চাষার ছেলে চাষ না করিয়া কেরাণী হয়, ছুতারের ছেলে উকীল হইবার জন্য লাফাইতে থাকে, রজক নন্দন ডেপুটী হইবার জন্য আস্ফালন করে—শিক্ষালাভ করিয়া তো

কেহ জাতীয় ব্যবসার উন্নতি করেনা—কেন? যাহাকে আমার শিক্ষা মনে করিয়া ব্যগ্র হইতেছি সে শিক্ষা কেবল দাস্যভাব স্ফুরণ করিয়া দেয়। আমরা শিক্ষার প্রভাবে কেবল চাকুরী করিতেই অনুরক্ত হই; আর ঐ দেখ অশিক্ষিত মাড়োয়ারী লোটাকম্বল সম্বল করিয়া দুর্জ্জয় মরুভূ হইতে আসিয়া তোমাদের বুকের উপর বসিয়া ক্রোড়পতি হইয়া রহিয়াছে—শিক্ষাগর্ব্বান্ধ বঙ্গবাসী চক্ষু চাহিয়া দেখ, শিক্ষা কাকে বলে! কেবল দুপাতা ইংরাজী পড়াকেই শিক্ষা বলে না, যে শিক্ষায় আত্মসম্মান-জ্ঞান জন্মে না, যে শিক্ষায় দেশের প্রতি টান্ জন্মায় না—যে শিক্ষায় জাতীয়ত্ব ত্যাগ করিতে হয়, যে শিক্ষায় মানুষ স্বার্থান্ধ হইয়া জাতির ও দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়,—সে শিক্ষার আর গৌরব করিও না, থাক্।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠের প্রভাত—সারারাত্রি গুমটে ঘুম হয় নাই—ভোরবেলা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে একটু ঘুম আসিয়াছিল—এমন সময় মধুর উত্তর ললিতের করুণ অবশ উদাসধ্বনি কোথা হইতে আমার কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিতেছিল—তখন আমার অবস্থা "আধ-ঘুম ঘোর আধ জাগরণের" মত—জানালার ফাটল দিয়া দুএকটী পথহারা রবিরশ্মি আসিয়া আমার নিদ্রালস নয়নকে সচেতন করিবার জন্য বড়

ব্যস্ত ছিল—তবুও ঘুম যেন ছুটীয়াও ছুটেনা! কণ্ঠস্বর চৈতন্যের—গানটার দু একটা লাইন যাহা মনে আছে তাহা এই :—

"আমি সকল কাজের পাই মা সময় তোমায় ডাকার সময় পাই না—আমি সকলের পানে সদা চেয়ে থাকি—তোর পানে কেন চাই না।" গানটা আদিম অবস্থা হইতে কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে কি করিয়া চৈতনের অধিকারভুক্ত হইল, তাহা আমার জানা ছিল না। এ সংশোধিত সংস্করণ শ্রীচৈতন্যের কৃত কি অন্য কোন ভাষ্যকারের কৃত, তাহা অনুসন্ধান করিবার কোন সূত্র ও ছিল না আরও কিছুকাল পরে ইহা হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিকামী প্রত্নতত্ত্ববিদের থিসিসের মেরুদণ্ড হইতে পারে এরূপ আশা করা অন্যায় হইতে পারে না। সঙ্গীতটা যাইহোক, গায়কের ভাবে তাহাকে সত্যই মধুর ও উপভোগ্য করিয়াছিল। গান শুনিয়া বাহিরে আসিলাম—চৈতন তখনও তন্ময় কিন্তু তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে কিছু কোপান্বিতা দেখিলাম। সে আপন মনে বকিতেছে—চৈতন্ আপন মনে গাহিতেছে, কাহারও কাহারও প্রতি লক্ষ্য নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই—শুনিলাম চৈতন্ গৃহিণী (যাহার নামটা বহু গবেষণাতে ও আমি নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই) বলিতেছেন "মরণ মিন্সের গলা দেখ না, যেন বাবা বদ্যিনাথের ষাঁড়, ভোর হলেই ষাঁড়চেচানি আরম্ভ হল, মনে করেন অমন গাইয়ে বুঝি আর তল্লাটে নেই, বন দেশের শ্যাল রাজা—এখানে লোকালয় নেই তাই, নইলে এতদিন ধোপায় টেনে নিয়ে যেত—যত বুড়ো হচ্ছেন তত যেন রস বাড়ছে—এতবলি একটু থাম্, তা নয়—আজ কর্ত্তাবাবু এসেছেন—তা নঘু গুরু জ্ঞান নেই; এত অসৈরণ বাবু আমার সহ্যি হয় না" "ওরে

মাগী গানের তুই কি বুঝবি বল। এ হল একটা রস। শাস্ত্রে বলে "ন বিদ্যাৎ সঙ্গীতাৎ পরা" কি না গাওনার পর বিদ্যা—তুই হলি খাস চাষী, ভেমো গয়লার বেটী, তুই এর কি বুঝবি।" "থাম থাম মিনসে, আর মুখ নাড়তে হবে না, এই ভেমো গয়লার বেটী ছিল তাই এ যাত্তারা তরে গেলি, বেইমান্ নেমক্‌হারাম কোথাকার—ওঃ উনি কি নবাব পুত্তুর এলেন, গয়লা, চাষা—আশী বচ্ছর না হলে বুদ্ধি হয় না বলে সাধে"—"তুই রসের কিছু বুঝবিনে খালি ঝগড়া কর্ব্বি বৈত নয়।" "থাম্ থাম্ গয়লার আবার রস—লজ্জা করে না" "ওরে মাগী হাড়হাবাতী, কত বড় পণ্ডিতের চাকর আমি তা জানিস—শুনিছি পণ্ডিত কৃষ্ণদাস নামে একজন কবি ছেল—সে আগে আমার মতই নীরেট ছিল তবে আমি গয়লার ঘরের গরু, সে ছিল বামনের ঘরের, একদিন তার উপর মা স্বরস্বতীর ভর হয়" "থাম্ মিন্সে, সকালবেলা কি যে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে বকিস তার ঠিক নেই" "আরে পাগলী গল্পটা শেষই কর্ত্তে দেনা—গল্প আদ্দেক্ শুনে আর না শুন্‌লে আধকপালে হয় জানিস্" চৈতন্যগৃহিণী বোধ হয় এমন সত্যের অপলাপ করিতে সাহসী হইল না—অগত্যা এক পর্দ্দা সুর নামাইয়া বলিল "নে তবে চট করে বলে ফেল, আমার কি এখন সময় আছে? দুধ দুইতে হবে—ভোরে বাছুর-টাকে আটকে রেখেছি, সেটা ছট্‌ফট্ কচ্ছে, তারপর গরুটাকে মাঠে বেঁধে দিতে হবে, এক ঝোড়া খড় কাটতে হবে, একরাশ গোবর পড়ে রয়েছে—" গৃহিণীর কর্ত্তব্যকর্ম্মের তালিকা শুনিয়া চৈতন্য যেন কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল "বটে! তবে নে চট্ করে শুনে নে—এক যে ছিল রাজা তার নাম বিক্রম সিং, কেষ্টচন্দর মহাকবি নাকি তার সভাপণ্ডিত ছিলো

—তারপরে মশাই সেই কবি কেষ্টদাসের ঘরের পাশে একটা গোমুখ্য থাকৃত। সেই কবরেজ মশাই যখন ভোর বেলা উঠে বিছানায় শুয়ে শোলোক বলতো—সেই গোমুখ্যু তাই শুনে এমনি পণ্ডিত হলো যে রাজ-কন্যের ঘাড়ে বার বছরের চাপা বেহ্মদত্তিটা তাই শুনে অশোথগাছের মস্ত একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পপ্পড় করে পালাল—তা সেই গয়লার বামুন যদি কবরেজের কাছে থেকে পণ্ডিত হতে পারলে—আমি এত বড় পণ্ডিতের খাস্ চাকর হয়ে একটা গুরুমশাই হতে পারি না" "হ্যাঁ হ্যাঁ তুই খুব পণ্ডিত, অকর্ম্মার ধাড়ী, আর খোরা খোরা ভাত গেলবার যম" বলিয়া চৈতন্যভামিনী বিরক্ত পদসঞ্চারে গোদোহনার্থ গমন করিলেন। চৈতন্যচরণ এমন পাণ্ডিত্যটা নিস্ফল হইল দেখিয়া মনের দুঃখে হুঁকা কলিকার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল। অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রভাতে এই দাম্পত্যকলহ দেখিয়া একটা প্রীতি অনুভব করিলাম, এই মধুর রসাশ্রিত নির্ম্মল দাম্পত্যকলহও আজ অন্তর্হিত হইয়াছে; এখন দাম্পত্যকলহের প্রধান উপকরণ হয়েছে—গহনার ফর্দ্দ, যার মীমাংসা করিতে গরীব স্বামীর রক্তপাতার্জ্জিত অর্থের অনেক ব্যয়ের (অপব্যয়!) প্রয়োজন হয়—কলহের অকারণ কারণ ও সরলতা আজ কাল দুর্ল্লভ।

চৈতন্য গৃহিণী যতটা অকর্ম্মণ্যতার কলঙ্ক তাহাকে দিল, বাস্তবিকই সে ততটা অলস ছিল না, কারণ দেখিলাম এই দুস্তর বনভূমির কিয়দংশ পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিল তাহাতেই প্রয়োজন মত ধানের চাষ ও তরি তরকারীর ক্ষেত করিয়াছিল কোথাও আকের চাষ, কোথাও একটু তামাকের ক্ষেত মোটের উপর মনুষ্যের

জীবনধারণের উপযোগী সব জিনিষই সে স্বীয় পরিশ্রমে উৎপন্ন করিত, অথচ শিশুর মত সরলভাবে পরমানন্দে দুটী প্রাণী এই নির্জ্জন পুরীতে কি করিয়া সময় কাটাইত, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। আর যখন তাহার প্রভু এই নির্জ্জন পুরীতে পদার্পণ করিতেন, তখন প্রাণ মন দিয়া তাহার সেবা করিয়া যেন সে ধন্য হইত। শুনিলাম সস্ত্রীক গঙ্গাসাগর দেখিতে আসিয়া সে বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া সহযাত্রীগণ কর্ত্তৃক সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু ঐ মুর্খরা পত্নীটী মৃতকল্প স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই, এই সময়ে ডাক্তার শঙ্করলাল কার্য্যব্যপদেশে আসিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রাণদান করেন; তদবধি সে বিনা মাহিনার গোলাম হইয়া তাঁহার এই নির্জ্জন কুঠীর রক্ষকরূপে বাস করিত। কৃতজ্ঞতার স্বরূপ, এই দুটী নরনারী দর্শন করিয়া দেব দর্শনের চেয়ে বেশী পুণ্যলাভ হইল মনে করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। বাঙলায় আর কি চৈত্যনর মত ভৃত্য দেখিতে পাইব—আশা তো হয় না; কারণ আমরা যে এখন দ্রুতপদবিক্ষেপে সভ্যতার সৌধশিখরে আরোহণ করিতেছি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সালোয়া সে রাত্রে তাহার পিতামহের কক্ষেই ছিল—আমি প্রাতঃভ্রমণ হইতে প্রত্যাগত হইলে ডাক্তার আমাকে ডাকিয়া সেই কক্ষে লইয়া গেলেন—কক্ষটী বেশ প্রশস্ত, দক্ষিণদিকে একটী বড় জানালা আছে

তাহার পার্শ্বে দ্বার, দ্বারের একপার্শ্বে আর একটী জানালা—পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিকটা সবই দেয়াল—ঘরের মধ্যে একটা তক্তপোষের উপর খুব নরম বিছানাকরা—বৃদ্ধ তাহাতে শুইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন, বিছানার চতুর্দ্দিকে ১ হাত উচ্চ কাঠের রেলিং দিয়া ঘেরা—ঘরের এককোণে একটী ছোট টেবিল তাহাতে—দু একটী শিশি বসান আছে—উত্তরদিকে দেয়া-লের কাছে প্রকাণ্ড একটী কাল বাক্স বসান—তক্তপোষের নীচে একটী বড় কাঠের কেসে কতগুলি ইলেক্ট্রীক সেল রহিয়াছে তাহা হইতে দুইটী তার আসিয়া তক্তপোষের দুইপ্রান্তে লাগিয়া আছে—পশ্চিমের দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড ব্যারোমিটার টানান—আর একটা ছোট এয়ার-থার্ম্মমিটার তক্তপোষের গায়ে আটকান আছে। ঘরে ঢুকিতে দ্বার-দেশে একটা প্রকাণ্ড ষ্টোভরেঞ্জ বসান আছে—এই মনুষ্যবিবর্জ্জিত-দেশে এত সব জিনিস কি করিয়া আসিল ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হই-লাম। ডাক্তার আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—যে চিকিৎসায় আজ আমরা হস্তার্পণ করিতেছি এতে এগুলি অত্যাবশ্যকীয় বলে আগে থাক্‌তে সংগ্রহ করে এনেছি—নৈলে এখানে হঠাৎ দরকার হলে তো কিছু পাবার যো নাই—আচ্ছা তুমি ব্যাটারিটা চার্জ্জ কর্ত্তে থাক, আমি ততক্ষণ আর দুটো যন্ত্র আনি—ডাক্তার নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সালোয়া বলিল "ডাক্তারবাবু, আমায় কি আর দাদার কাছে থাক্‌তে দেবেন না—দেখুন আপনি শঙ্করদাদাকে একটু বলে দেবেন—আমি কখনও একদিনের তরেও ওঁর কাছ ছাড়া হই নি" "বোধহয় এখন আর তোমার এখানে থাকা সম্ভব হবে না—তবে ভাব্‌নার কোন কারণ নেই—আমি দিনরাতই ওঁর কাছে থাক্‌বো।" "থাক্‌লেও ওঁর কখন কি চাই

আপনি কি করে বুঝবেন—চিকিৎসা আপনি কর্ত্তে পারেন কিন্তু সেবা তো পুরুষমানুষের কাজ নয়?" "তা সত্য, তবে যার উপায় নেই তার জন্যে বৃথা ভেবে কি হবে—তোমার পিতামহের যা অবস্থা তাতে তিনি যে আর বেশীদিন বাঁচ্‌তে পার্ত্তেন এমন বোধহয় না—বরং সাধারণ মানুষের হিসাবে তিনি খুব বেশীই বেঁচে গিয়েছেন, এ অবস্থায় যদিই তাঁর সেবার অভাবেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক মৃত্যু হয়, তার জন্য আর শোক করা উচিত নয়; বরং যদি ডাক্তার শঙ্করলালের চেষ্টায় তিনি অজর অমর না হউন, অন্ততঃ আর কিছুদিন বাঁচেন, তাতে তোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না।" "তা ঠিক, তবু ওঁর সেবা করে আমি এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ওঁকে ছেড়ে থাকা সত্যই আমার পক্ষে কষ্টকর।" "তা কি আমি বুঝিনা সালোয়া" এই সময় রোগী পার্শ্বপারবর্ত্তন করিলেন—সালোয়া নিকটে যাইলে তিনি কয়েকটী অস্পষ্ট শব্দ করিলেন—সালোয়া আমায় বলিল ডাক্তার বাবু এদিকে আসুন তো—আমি তাঁহার কাছে যাইলাম—তিনি যেন তাঁর শরীরে যা কিছু শক্তি ছিল একবারের মত একত্রে করে সালোয়ার হাতখানি ধরে আমার হাতের উপর দিয়ে একবার চাইলেন, আমরা দুজনেই মাথা নত করলুম—বলবার মত কিছু ভাষা ফুটে বেরুল না; তার পরই তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন! ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই "এই যে সম্প্রদান হয়ে গেল।" এই কয়টী কথা কাণের কাছে ধ্বনিত হতেই—চাকতে আমাদের দুজনের হাত ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেল—দেখিলাম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ডাক্তার শঙ্করলাল,—"খুব ফাঁকিটা দিলি দিদি— আমি বারাবরই ভাবতুম যে ও সৌভাগ্যটা আমারই হবে, তা তোর বুড়ো

ঠাকুর্দ্দা যে এমন করে বাদ সাধবে তাকি জানতুম” আমি লজ্জায় যেন আর মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না—তবু আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, লজ্জায় সালোয়ার মুখ রাঙা সিঁদুরের মত হইয়াগেছে। সালোয়া সরিয়া গিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মেঝেতে বসিল—আমি নত মস্তকেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাঃ শঙ্কর লাল হাতের বাক্সটা নামাইয়া বলিলেন “যাক্ ফাকি তো পড়লুমই, তা দেখি যদি বুড়োকে বাঁচিয়ে রায়টা বদলে নিতে পারি, শেখর আর দেরী করা চলবে না আজ থেকেই কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হবে।” আমি বলিলাম “কি কর্ব্ব আজ্ঞা করুন” ডাক্তার শঙ্করলাল সেই বাক্সটার উপর বসিয়া বলিলেন “সালোয়া এইবার তুমি নিজের ঘরে যাও, যত দিন না তোমার দাদা মশায়ের চিকিৎসা শেষ হয়, ততদিন আর এ ঘরে আস্‌বে না—যদি ভগবান্ আমার চেষ্টা সফল করেন, তবে তোমার দাদামহাশয় দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ যৌবন লাভ করবেন, আর যদি না পারি তাহলে তাঁর মৃত্যু হবে তোমায় একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে শেষে তুমি মনে না কর, যে তোমার দাদামহাশয়ের চিকিৎসা বা সেবার অভাবে মৃত্যু হল।” সালোয়া মাথা হেঁট করে ধীরকণ্ঠে বলিল “না তা যে আমি মনে কর্ব্বোনা তা আপনি বেশ জানেন—আর তা নাহলে দাদামশাই নিজে ইচ্ছাকরে আপনার হাতে নিজের চিকিৎসার ভার দিতেন না” “আর বিশেষতঃ যখন নাত জামাই সেবার ভার নিয়েছে কি বলিস দিদি” বলিয়া শঙ্করলাল পাগলের ন্যায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই শুষ্ক শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞের মুখে এই সরল হাস্যটি যে উদার কোমল হৃদয়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বড় আনন্দিত হইলাম—এই নীরস

পাষাণসম শুষ্ক—মনুষ্যটীর অন্তরে ও একটী হৃদয় স্নেহবৎসলা ভোগবতীর মত প্রবাহিতা ছিল। সালোয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরপদ-বিক্ষেপে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, যাইবার সময় কেবল আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চাহিয়া গেল—বোধহয় যেন জানাইল, "যে এখন থেকে সব ভার তোমার, তুমি আর আমি অভিন্ন", এর পূর্ব্বে তাহার মুখে দুইবার যে লজ্জা-রক্ত-রাগ দেখিয়াছিলাম এখন তাহার সম্যক অর্থ অবগত হইলাম।

ডাক্তার শঙ্করলাল বলিলেন "তুমি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার কর শেখর!" আমি সবিনয়ে বলিলাম "দেখুন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন চর্চ্চা আমি জীবনে কখন করি নাই তবে হিন্দুর ছেলে আত্মা অস্বীকার করি না।" "ভাল; তাহলে যদি চিকিৎসার অসাফল্যে এই রোগীর মৃত্যু হয় তা হইলে আমায় নরহত্যাকারী মনে করিও না; কারণ দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর—দেহের পরিণতিই যখন মৃত্যু তখন ইঁহার মৃত্যুর দায়ীত্ব আর আমাকে অশিবে না। আমি নিজে জড়বাদী, এই জড়দেহটীতে প্রাণবায়ু যাহাতে স্থায়ী হয় তাহাই আমার প্রতিপাদ্য; আজ তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে মনুষ্য অজর অমর হইবে—এই বৃদ্ধ দীর্ঘজীবী, সুতরাং ইঁহার দেহের প্রত্যেক অংশ ক্ষয়ের অর্থাৎ রোগের আক্রমণ শক্তির প্রতিকূল ক্ষমতা সম্পন্ন—তাই বাছিয়া বাছিয়া ইঁহাকেই আমার পরীক্ষার যোগ্যপাত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছি—দশ বৎসর পূর্ব্বেএকবার আয়ুর্ব্বেদ সম্মত উপায়ে এক রোগীর উপর এই পরীক্ষা করি তাহাতে নিস্ফল হই সে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তারপর সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আর এক রোগীর উপর

এই পরীক্ষা করি সেবারেও আমি অকৃতকার্য্য হই—তারপর যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন—তন্ত্রোক্ত সাধন প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিয়া পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করি, গবেষণাকালীন একটা তথ্য আমার লক্ষীভূত হয় সেটা আয়ুর্ব্বেদের মকরধ্বজ-প্রস্তুত-প্রণালী; এই যে সর্ব্বরোগের ঔষধটি—ইহার প্রবর্ত্তক কে? যিনিই হউন তিনি যে আয়ুঃ রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই—অজর অমর হইবার ঔষধ আবিষ্কার করিতে করিতে ইহার উৎপত্তি হয়—অবশ্য কোন ক্রটী বা কোনরূপ জ্ঞানের অল্পতা হেতু চেষ্টা সফল হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম ইহার পরে ভারতবর্ষে আর এ সম্বন্ধে কোন উন্নতির চেষ্টা বা জীবন রহস্য উদ্ঘাটনে কোন প্রয়াস করা হয় নাই—কিন্তু তিব্বতের লামাগণ এ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছেন; সেইজন্য তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তিব্বতীর ছদ্মবেশে, সেই দেশে তিন বৎসর অতিবাহিত করি। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, তাহাদের ভুলাইয়া একখানি পুস্তকের অস্তিত্ব জানিতে পারি। একজন ভুটানী ভৃত্য আমার সঙ্গী ছিল—কংফুপাহাড়ের বুড়ো লামার ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপ হইতে সেই পুস্তক অপহরণ করিয়া আমারা দুজনে পলায়ন করি—লামারদল কোনরূপে তাহা অবগত হইয়া আমাদের অনুসরণ করে, আমার ভুটানী ভৃত্য ধরা পড়ে, তাহাকে গলায় পাথর বাঁধিয়া জীবন্ত নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে; আমি কোনরূপে প্রাণ লইয়া কলিকাতায় ফিরি—তারপর দুর্গা-দাসের 'তার' পাইয়া বর্ম্মায় যাই। সেই কাণা চীনাম্যান সিন্‌ফিউ, বুড়ো লামার ভৃত্য, তদবধি সে ঐ পুস্তক কাড়িয়া লইবার সবিশেষ চেষ্টা করিতেছে, এমন কি আমায় হত্যা করিতেও সে পশ্চাৎপদ নয়—তবে

এবারে বোধ হয়ে তাকে ফাঁকি দিয়েছি।" আমি সব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম "আপনার জীবন যেমন ভয়াবহ,তেমনি আশ্চর্য্য !" "না—না, শেখর আমার জীবনের সঙ্গেও তুটোর এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই—সাধারণ জিনিষের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই—যা অসাধারণ, যা বিস্ময়কর, তাতেই আমার আনন্দ। এখনি আমি কার্য্যারম্ভ কর্ত্তে চাই ; এখন রোগীকে চব্বিশ ঘণ্টা সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে, সুতরাং আমি একে এখন যোগনিদ্রায় অভিভূত রাখব, তারপর এই দেহের প্রসাধন আরম্ভ কর্ব্ব ; লোলিত চর্ম্ম, শিথিল ইন্দ্রিয়, সমস্ত দ্রব্যগুণে যৌবন ভাবান্বিত কর্ত্তে হবে—তবে এ সকল প্রক্রিয়া প্রয়োগ কালীন—ঘরের ব্যাটারীর বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালনও কর্ত্তে হবে এবং পরমায়ু বৃদ্ধিকরিবার ঔষধও প্রয়োগ কর্ত্তে হবে—সেটা ঠিক। এবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রথার সমন্বয়ে চিকিৎসা করে দেখব। তোমার কাজ হচ্ছে অনুক্ষণ সতর্ক থাকা—রোগীর অবস্থার একটু বৈষম্য দেখলে তৎক্ষণাৎ আমায়ডাকবে, আমি পাশের ঘরে থেকে এ সম্বন্ধে যা কিছু অনুশীলন করা আবশ্যক সব কর্ব্ব ; এই ব্যাটারীর সংযুক্ত একটি ঘণ্টা আমার ঘরে আছে, দেয়ালের এই বোতামটি টিপে দিলেই বেজে উঠবে—আর এই সব চার্ট রইলো—কখন কখন তাপ কত থাকা দরকার লেখা আছে Air Thermometer এ যদি তাপ কম থাকে দেখ, ষ্টোভ জেলে দিবে ওর নল থেকে গরম হাওয়া ঘরে ঢুকে তাপ বৃদ্ধি করবে—আর যদি তাপ কমাইবার আবশ্যক হয়, তো দেয়ালের এই ট্যাপটী খুলে দেবে এতে উপর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরের তাপ কমিয়ে দেবে ; আর খাটের নীচে ব্যাটারী থেকে সর্ব্বদা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত থাকবে

খাটের গায়ের ঘড়ীতে তার পরিমাণ জান্‌তে পারবে—যদি কমে যায় এই হাতল ধরে ঘুরাবে, তাহলে বৈদ্যুতিক শক্তি বাড়বে—এখানেও একটী আলাদা চার্ট এই দেয়ালে রইল—খাবার কেবল গরম দুধ, অন্য কোন খাদ্য দেবে না—অন্ততঃ ১৫ দিন তো নয়—কেমন সব বুঝে নিয়েছ—আমি যন্ত্র ও চার্টগুলি দেখিয়া বলিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ"—তিনি বলিলেন "এইবার একটু গরম দুধ খাইয়ে দাও আমি এঁকে ঘুম পাড়িয়ে দি এখন ২৪ ঘণ্টা আর এঁর কাছে আসবার আবশ্যক হবে না, তারপর প্রসাধন আরম্ভ হবে।" আমি দুধ খাওয়াইয়া দিলে বৃদ্ধ যেন একটু সুস্থ হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—ডাঃ শঙ্করলাল তাঁহার চক্ষের দিকে একমাত্র দৃষ্টি চাহিয়া রহিলেন ও ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতে লাগিলেন—মিনিট পোনেরোর মধ্যে বৃদ্ধ নিদ্রিত হইলেন—তাঁহাকে সেই অবস্থায় 'মরাসোসাইটের' ঈজিপ্সিয়ান মমীর' মত দেখাইতেছিল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আমরা উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। আমি শঙ্কর লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই সামান্য দুধটুকুর উপর ২৪ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখা কি নিরাপদ মনে করেন" "শুধু দুধের উপর আমি নির্ভর করি নাই। আমি আসিয়াই ওঁকে একটা জীবনীশক্তি সংস্থাপক ঔষধ সেবন করাইয়াছি।" আমি অনেক আশ্বস্ত হইলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজকের দিনটা আমার একরকম ছুটী, কারণ কাল থেকেই আমায় রোগীর তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকতে হবে, আর যেরকম ব্যাপার বুঝছি তাতে অন্ততঃ ২।৩ মাসের কম রেহাই পাবনা সুতরাং আজকার দিনটা একবার ভালকরে সুন্দরবনটা—অন্ততঃ বাড়ীর আশ পাশটা দেখিয়া লইব স্থির করিলাম। এ বিষয়ে চৈতন্য চরণের সাহায্য আবশ্যক, কারণ একাকী দিবাভাগে এখানে বাহির হইবার সাহস আমার ছিল না। আহারের সময় একবার মাত্র সালোয়ার দেখা পাইয়াছিলাম তাও চকিতের মত, তবে দেখিলাম তার মনটা এখন আর তত ভার নয়, সে চৈতন্য গৃহিণীর নিকট বসিয়া গল্প করিতেছে। আহারান্তে চৈতন্যচরণের খোঁজ করিয়া জানিলাম "সে জানোয়ারদের খাবার খাওয়াচ্ছে" ব্যাপারটা কিন্তু বুঝিলাম না—কি জানোয়ার? চৈতন্য কি বাঘ পুষিয়াছে নাকি?—সুন্দরবনে আর কি জানোয়ার সুপ্রাপ্য! ডাক্তার শঙ্করলাল সেই প্রাতে আমায় বিদায় দিয়াই নিজের কক্ষে যে প্রবেশ করিয়াছেন এখনও পর্য্যন্ত তো তাঁর কোন রকম সাড়াশব্দ নাই; তাঁহাকে আবার ডাকিবার হুকুম নাই। আহারাদির আবশ্যক হইলে তিনি নিজেই বাহির হইবেন বলিয়া দিয়াছেন; সুতরাং আহারান্তে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটু গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা হইল—গড়াইতে গড়াইতে একটু তন্দ্রার ও আবির্ভাব হইয়াছিল; এমন সময় কে যেন বলিল "দাদাবাবু কি আমায় ডাক্‌ছিলেন" চাহিয়া দেখি চৈতন্ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আমি

উঠিয়া বলিলাম "চৈতন্ তোমাদের গ্রামে এলুম, একবার গ্রামটা দেখিয়ে আন"। হো হো করিয়া চৈতন হাসিয়া উঠিল, বলিল "বাঘামামার বাড়ী বেড়াতে যাবেন দাদাবাবু" "কেন তোমাদের দেশে কি আর কোন লোক নেই নাকি হে" "আজ্ঞে লোকের মধ্যে এই আমরা দুটী আর ঐ দিকে ভাঙ্গামন্দিরে এক সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আসেন—এখন বোধ হয় নেই তা চলুন একটু ঘুরে আসি বলিয়া সে বাহির হইল আমি একগাছি ছড়ি হাতে লইয়া উঠিলাম, চৈতন আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল "দেখ কাণ্ড, একি আপনার কলকেতা গা—ঐ ছড়ি টুকুতে একটা শেয়ালও ঠেকান যাবেন না, ও রাখুন, আমার সঙ্গে আসুন এদেশে বেড়াবার ছড়ি আমি দিচ্ছি—বলিয়া নিজের ঘর থেকে দুটো বড় বড় পাকা বাঁশের লাটী বাহির করিল তাহার মাথায় আবার দুটো বল্লমের ফলার মত পরাণ আছে—এই একটা নিন্ বলিয়া আমার হাতে একটা দিল—বুঝিলাম দেশকাল পাত্রানুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। "চলুন গাঙের ধারে বেলেপাহাড়ে বেড়িয়ে আসি" বলিয়া চৈতন অগ্রগামী হইল, "আমি তাহার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ব্যাঘ্রভীতি যে আমার ছিল না তাহা নহে, তবে ভরসার মধ্যে শ্রীচৈতন্য। আর এরকম জায়গায় এসে একেবারে নেহাৎ কিছু না দেখে অন্ধের মত ফিরিয়া যাইবার অভি-প্রায় আমার ছিল না; সেইজন্য ভয়কে ভয় না করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিয়াছিলাম। বেলেপাহাড়টী বাস্তবিক দেখিবার জিনিস সেটা ঠিক গাঙের ধারেই অবস্থিত—সেটা যে ঠিক পাহাড় তাহাও বলা যায় না, বালুকারাশি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে যেন প্রস্তরে পরিণত হইতেছিল সাধারণ জমী হইতে আন্দাজ ১৫।১৬ হাত উচ্চ, আর ইহার নীচেই গাঙ,

গাঙের ঢেউয়ে পাহাড়ের তলাটী যেন অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এটা প্রায় বৃক্ষহীন, তবে চতুর্দ্দিকে সবুজ ছেৎলার খুব প্রাদুর্ভাব দেখিলাম। এখান হইতে গাঙটী সমুদ্রে মিশিয়াছে পশ্চাতে দিগন্তব্যাপী গভীর অরণ্য তাহাতে সবুজ পত্রের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, আর সম্মুখে অকূলে প্রবাহিত নীলজলস্রোত, উপরে বিবিধ-বর্ণ-রঞ্জিত মেঘমালা। বন হইতে বহুবিধ বন্যপক্ষীর কলকণ্ঠধ্বনি, দূরাগত বংশী ধ্বনির ন্যায় মধুর শুনাইতেছিল—আর তার মাঝে দাঁড়াইয়া আমরা ছোট দুটী বিহ্বল মানুষ। প্রকৃতি যেন তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া সযত্নে আমাদের প্রদর্শন করাইতেছিলেন—এ বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিবার আর কেহ ছিল না ; এমন সময় একটা উৎকট বন্য গন্ধে স্থানটা ভরিয়া উঠিল। চৈতন বলিল "ভয় পাবেন না দাদাবাবু, মামা যাচ্ছেন কেবল চোক দুটী বুঝবেন না, ঠিক সমানে চেয়ে থাক্‌বেন, আমি আছি কোন ভয় নেই আপনার।" মুখে বলিলাম বটে "ভয় কি জন্য" কিন্তু সত্য বলিতে কি আমার সর্ব্বশরীর যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বুকটা যেন গুর গুর করিয়া কাঁপিতে ছিল—হাতপা যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল, চোখ দুটী অতিকষ্টে মেলিয়া রাখিতে সমর্থ হইতে ছিলাম ; দেখিলাম আন্দাজ ৪০।৫০ হাত দূরে একটী বিরাট্‌কায় ব্যাঘ্র বেশ ধীর পদবিক্ষেপে যাইতেছে, কেবল মাত্র পশ্চাৎ ভাগ দেখা যাইতেছিল, মুখখানি তবুও দেখি নাই, দেখিলে কি হইত বলিতে পারি না। শার্দ্দূল প্রবর বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে গিয়া গাঙ্গে জল পান করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন ; চৈতন্য ঠিক লাঠীটী হাতে করিয়া সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—তাহার কোন রূপ বৈকল্য দেখিলাম না। কিসের বলে যে

এই পল্লীবাসী এত সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইল, তাহা জানি না। বাঘ চলিয়া গেলে, চৈতন তাহার উদ্দেশে একটী প্রণাম করিয়া বলিল— "দাদাবাবু ওঁরা এই বনের রাজা, আমি আবাদ কর্ত্তে কর্ত্তে কতদিন দেখেছি, আমার ক্ষেতে দিয়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু কিছু বলেন নি, ওঁরাও হাজার হোক দেবতা তো।" মনে ভাবিলাম দেবতা মাথায় থাকুন, এখন প্রাণটা লইয়া ফিরিতে পারিলে বাঁচি। চৈতনকে বলিলাম চল—এতো দেখা হল—আর কিছু দেখবার আছে—উদ্দেশ্য চৈতনকে জানান, যে আমি ভয় পাই নাই—কিন্তু আমার অন্তর যেন বলিতেছিল সে সব বুঝিতে পারিয়াছে—চৈতন বলিল "আর যখন বেরুবার সময় হবে না, তখন কালীবাড়ী দেখে আসবেন চলুন" "আমি শুষ্কমুখে বলিলাম "চল"। পাহাড় থেকে নেমে ক্রমশঃ বনপথে যাইতেছিলাম— চৈতন্য আগে লাঠী ঠুকিতে ঠুকিতে যাইতেছিল—বন্যদেবতাদের বোধহয় সতর্ক করিয়া দিতেছিল, একটু যাইবার পর দেখিলাম সাঁ করে একটা সাপ চলে গেল—চৈতন্ বলিল "ও কিছু নয় দাদাবাবু, ওটা হচ্ছে গোখরা সাপ—ওঁরা ব্রাহ্মণ, ওঁদের মাথায় কেষ্টঠাকুরের পায়ের দাগ আছে—ওঁদের না মারলে কিছু বলেন না"। বুদ্ধদেবের অহিংসা-ধর্ম্মাবলম্বী নাগরাজকে দেখিয়া কিন্তু আমার কালী দর্শন বাসনা ক্রমশঃই মন্দীভূত হইতেছিল—দূরে একটা বিরাট গর্জ্জনধ্বনি শুনিলাম, সে হুঙ্কার শুনিয়া বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন শুখাইয়া গেল,চৈতন তথাপি নির্ব্বিকার, বলিল "ওতে ভয় কর্ব্বেন না দাদাবাবু, ওটা ওঁদের খেলা হচ্ছে—আর ও প্রায় পাঁচসাত রশী দূরে—এই আমাদের মানুষেরা যেমন কুস্তি করে না, সেই রকম ওঁরাও লাফালাফি ক'রে খেলা করেন"—খেলা তাঁহারা যেমনই

করুন,কিন্তু যে মৃদু মধুর গর্জ্জনের নমুনা দিলেন,তাহাতে কিন্তু আর এক-পদও অগ্রসর হইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না ; আমি একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলাম "এস চৈতন ফিরিয়া যাই—বেলা পড়ে এল" চৈতন একটু মৃদু হাসিয়া বলিল "আপনি ভয় পেয়েছেন দাদাবাবু, তবে থাক্ চলুন তবে, আমি থাক্‌তে আপনার একটী চুলও কেউ ছুঁতে পার্ত্তো না—যাক্ যখন খট্‌কা লেগেছে চলুন, ফিরি।" আমি আর প্রতিবাদ করিয়া সাহস প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলাম না—প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আবার সাহস প্রদর্শনের অবসর মিলিবে, কিন্তু তা বলিয়া কাঁচা প্রাণটা সুন্দরবনের রাজাদের উপহার দিয়ে যেতে পারি না। চৈতন্য গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"ছুঁয়োনারে শমন আমার জাত গিয়াছে।"

কতদিনের পচা এই রামপ্রসাদী গানটা, এই নিরক্ষর পল্লীবাসীর মুখ দিয়া কি মিষ্ট হইয়া বাহির হইতেছিল তাহা বলিয়া উঠা সাধ্য নহে—সুরের সঙ্গে আন্তরিক ভক্তি ও দেবতার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা যেন গলিয়া পড়িতেছিল, পশু পক্ষীরা ও যেন সে গান স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল—এই গান আগে এবং পরে কত ওস্তাদের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু গানে এমন প্রাণ দিতে কাহাকেও দেখি নাই ; তাঁরা হয়ত সুরকে জাগিয়ে তুলে তার সঙ্গে কসরৎ কর্ত্তেন—এ করেছিল প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হইতে অল্পই বিলম্ব আছে; দেখি রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া চৈতন্ গৃহিণী কুট্না কুটিতেছে আর সালোয়া তাহার কাছে বসিয়া কথা কহিতেছে; রান্নাঘরের মধ্যে নানাবিধ ছ্যাঁক্ ছোঁক শব্দে মিশ্র-নন্দনের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল; আমায় দেখিয়া সালোয়া বলিল "ডাক্তার বাবু কোথায় গেছ্লেন"। সব শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল "খবরদার আর বাড়ীর বার হবেন না"—আমি বিজয়ী বীরের ন্যায় বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলাম, কারণ এখানে ব্যাঘ্র-গর্জ্জন বা তাঁহাদের শুভাগমনের তত আশঙ্কা ছিল না—তাই দেখিয়া সে বলিল "হাসি নয় আমায় ছুঁয়ে দিব্যি করুণ, তা না হলে আমি শুন্‌ব না।" অগত্যা তাই করিলাম। মিশ্র-নন্দন ঘরের মধ্য হইতে আমাদের বন ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়া এক হাতে খুন্তি আর এক হাতে জলের ঘটী লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন "কেয়া বাবু সাব্ আপনে সের দেখ লিয়া, বড়ি তাজ্জব" বলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চৈতন্ বলিল "দাঁড়াও না ঠাকুরজী তোমাকেও একদিন ঘুরিয়ে আনচি" ঠাকুরজীর মুখখানা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল "বাপ্ হামসে না হোবে দাদা—হামি সেরেসে মোলাকাৎ নেহি করেগা" বলিয়া আবার নিজের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিল—বোধ হয় ভাবিল গতিক সুবিধা নয়! ডাক্তারবাবুর সংবাদ লইলাম—শুনিলাম তিনি একবার পাঁচ মিনিটের মত বাহির হইয়া নামমাত্র আহার করিয়া

আবার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি একাহারী সুতরাং এবেলা আর আহারাদির কোন আবশ্যকতা নাই, কাজেই আজকের মত তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক তাঁহার কর্ম্মলিপ্সা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, আমাদের মত দশটা যুবক যে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, তিনি একাকী তাহা অবহেলায় সম্পন্ন করিতে পারিতেন—এত বয়সেও বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই ঔদাসীন্য নাই—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অবসাদগ্রস্থ হইতে দেখি নাই—সদাই অনলস, আর প্রচণ্ড উৎসাহে কর্ম্ম নিরত। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম! জীবনটাকে যেন কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছেন—তাহাতে অবকাশ ছিল না, বিরক্তি ছিল না—কর্ম্মই একমাত্র তাঁহার লক্ষ্য—আর সংসারের কোন দিকেই দৃষ্টি ছিল না—তাঁহার সেই অবিরত কর্ম্মকারিতা দেখিয়া আজ আমার গীতার একটা শ্লোক মনে পড়িল।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ
শরীর যাত্রাপিচ তেন প্রসিধ্যেদ কর্ম্মণঃ ॥

তুমি নিয়ত কর্ম্মকর ; কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল। অপিচ যদি তুমি কর্ম্ম না কর তাহা হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।" বাস্তবিক আমরা যখন কোন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকি তখনও সত্যই আমরা বসিয়া থাকি না—হয় মন, নয় বুদ্ধি, নয় মুখ, নয় রসনা, কোন না কোন ইন্দ্রিয়—কিছু না কিছু কর্ম্মে রত থাকে; তখন সেই সময়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম না করিয়া অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও আয়ু ক্ষয় করে; কেবল জ্ঞানী মহাপুরুষেরা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরমকর্ম্মে রত থাকেন। এটা কেবল

আমাদের বুদ্ধির স্বল্পতা বশতঃ ঘটে, তবে আমরা মোহ তমসাচ্ছন্ন বলিয়া সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে না, এবং বৃথা কর্ম্মে দিনাতিপাত করিয়া আমরা মনে করি আমরা পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি—এ বুদ্ধি-বিভ্রাট না ঘটিলে আমরা সত্যই সময়ের মূল্য বুঝিতাম ও কর্ম্মপ্রভায় জগৎকে আলোকিত করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতাম। তবে আমাদের এ বুদ্ধি হয় না কেন—সেটা খালি অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে কি শোধরাইবে? অদৃষ্ট ও প্রাক্তন বলে দুটা সোজা রাস্তা আছে তাহাতেই আমরা সব দোষ ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের মনকে প্রবোধ দিই যে আমাদের কোন দোষ নাই; সেটাত আমাদের বুদ্ধির অল্পতা ব্যতীত কিছুই নহে।

হাতে বিশেষ কাজ ছিল না বলিয়াই হউক বা কর্ম্ম-বুদ্ধি তখনও অপরিপক্ক ছিল বলিয়াই হউক, চৈতনের সঙ্গে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম—কারণ আহার্য্য প্রস্তুত হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। প্রথমেই এই পতিত অট্টালিকার ইতিহাস শুনিলাম—এটা কোন রাজার বাড়ী ছিল—তাঁরা নাকি মুসলমানদের ভয়ে রাজত্ব ত্যাগ করে পালিয়ে এসে এই গভীর অরণ্যে এই বিশালপুরী ও বনমধ্যস্থ কালী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তার পর এক সন্ন্যাসীর শাপে নাকি তাদের বংশ লোপ হয়—বহুকাল এই পুরী ধ্বংসাবস্থায় পতিত ছিল—ডাক্তার শঙ্কর-লালের দৃষ্টি পড়ায়, ইহার মধ্যে ব্যবহার্য্য অংশটুকু তিনি মেরামত করিয়া এই নির্জ্জনে নিজের একটী বৈজ্ঞানিক সাধনাগাররূপে ব্যবহার করিতেছেন। কোন্ রাজা এখানে

পলাইয়া আসিয়াছিলেন এবং কোন্ সালে কোন সন্ন্যাসী তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শাপগ্রস্থ করিয়া তাঁহাদের লোপসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ছাড়িয়া দিলাম—কারণ যেরূপ প্রবল বেগে বাঙালী পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্বের সত্ত্বনিষ্কাশন করিতেছেন তাহাতে অচিরেই ঐতিহাসিক উপাদানের দুর্ভিক্ষ হইবে—এক বক্তিয়ার খিলিজির সপ্তদশ কি অষ্টদশ অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণে গৌড়াধিপ লক্ষণ সেন নাকি ভাতের থালা ফেলিয়া খিড়কী দিয়া জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন; শৈশবে, ইতিহাসে একমাত্র এই পলায়ন ব্যাপার মুখস্থ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে আছে—সুতরাং এই রাজার নামকরণ সম্বন্ধে আমার ঐতিহাসিক জ্ঞানে কুলাইবেনা বুঝিলাম। বুড়াবয়সে এখন শুনিতেছি যে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ব্যাপার সর্ব্বৈব মিথ্যা; তবে এই মিথ্যা কথা পড়িয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যাহা পাস করিয়া ছিলাম তাঁহারা তাহা ফেরৎ চাহেন নাই এই ভাগ্য! নতুবা বড়ই বিপদ গ্রস্থ হইতে হইত; এখন আর নূতন ইতিহাস নূতন করিয়া মুখস্থ করিয়া পাশ করি এমন যোগ্যতা নাই।

চৈতন্য তামাক খাইতে খাইতে গল্প বলিতেছিল, আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম; গল্প বলিবার একটী সুন্দর ভঙ্গী তাহার নিজস্ব ছিল, তাহাতে একটু আধটু অলঙ্কার একটু বা তাহার নিজের পাণ্ডিত্য মেশান ছিল; তবে সেটুকুতে সৌন্দর্য্য হানি না হইয়া বরং একটী প্রচ্ছন্ন হাস্যরসের সৃজন করিয়া শ্রোতার প্রাণে কৌতুক ও মনে কৌতুহল উৎপন্ন করিত। সালোয়াও গল্প শুনিতেছিল এবং মাঝে মাঝে

তাহার গল্প বলার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ চৈতন গৃহিণী যখন পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন "নে নে মিন্সে ওঠ্ রাত হয়ে গেল। ওনাদের কি খেতে দিতে দিবিনা নাকি—গল্প পেলে আর কিছু চায়না দিদি, এমন হাড়কুড়ে মাসকুড়ে—"চৈতন্য তখন অগত্যা গল্পে ছাড়িয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ডাক্তার ও আমি রোগীর কক্ষে আসিলাম, রোগী তখনও নিদ্রাচ্ছন্ন—নাড়ী দেখিলাম বেশ পরিষ্কার—দেহের তাপ, গৃহমধ্যে বায়ুর উত্তাপ সব দেখিয়া চার্টে লিখিয়া রাখিলাম, ডাক্তার বলিলেন এইবার ব্যাটারী চার্জ্জকর—ধীরে ধীরে হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে লাগিলাম; মিটারে নির্দ্দিষ্ট শক্তি পৌঁছিবামাত্র হ্যাণ্ডেল থামাইলাম। ডাক্তারের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কার্য্যের অবস্থা অনুকূল; আমায় বলিলেন "কি রকম বুঝিতেছ শেখর?" আমি উত্তর করিলাম "অবস্থা তো ভাল বলিয়াই বোধ হয়" "হুঁ-মনেত হয় এবার কৃতকার্য্য হইব—দেখি, ফলাফল অবশ্য ভগবানের হাত, আমরা কেবল উপলক্ষ্য—তবে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটী না হইলেই হইল।" এই বলিয়া কোণের দিকে গিয়া সেই প্রকাণ্ড কাল সিন্দুকের ডালা খুলিয়া ঘাটালে হাঁড়ীর মত একটা খুব পুরাতন, তৈলনিষিক্ত মৃৎপাত্র বাহির করিলেন। হাঁড়টী যে কোন্ পুরাকালের তাহার স্থিরতা ছিল না—তাহা হইতে

পুরাতন ঘৃতের মত একটা দুর্গন্ধময় স্নেহপদার্থ বাহির করিয়া আমায় বলিলেন "এইটা ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে মালিস কর—খুব ধীরে ধীরে মালিস করিবে, যাকে 'ম্যাসেজ' করা বলে বুঝেছ!" আমি ম্যাসেজ আরম্ভ করিলাম, তিনি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; অল্পক্ষণ দেখিয়া বলিলেন "বাঃ ঠিক হচ্ছে, তাহলে আমি চল্লুম—আধঘণ্টা পরে আবার আসব, মালিস কর্ত্তে কর্ত্তে মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রীক মিটারে নজর রাখবে; আর ঘরটা যেন বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা না হয়ে পড়ে, সে দিকেও নজর রাখবে।" বলি তিনি চলিয়া গেলেন, আমি নীরবে বসিয়া মালিস করিতে লাগিলাম। মালিসের দুর্গন্ধে যেন গা বমি বমি করিতে লাগিল; পকেটে ইউক্যালিপ্টিসঅয়েল-লাগান রুমাল ছিল তাই রক্ষা, নতুবা বমন দমন হইত কিনা সন্দেহ।

ঠিক অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আসিলেন—হাতে একটা টেষ্ট টিউব—তাহাতে গন্ধও বর্ণহীন জলের মত একটু তরল পদার্থ রহিয়াছে—আমায় বলিলেন এ থেকে পাঁচফোঁটা রোগীকে খাওইয়া দাও, আর যদি একান্তই খাওয়ান সম্ভব না হয় তো বোধ হয় ইন্‌জেকসন্ করিতে হইবে। আমি ঔষধ লইয়া মুখে দিলাম ও ধীরে ধীরে ঔষধ গলাধঃকৃত হইল, ডাক্তার ও আমি উভয়েই আনন্দিত হইলাম। তারপর তিনি রোগীর সর্ব্বগাত্র খুব সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মালিসে ও কাজ সুরু হয়েছে" আমি বলিলাম" আমিতো কিছুই বুঝিলাম না" "ভালকরে দেখদেখি?" আমি খুব ভাল করিয়া দেখিয়াও কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না। তিনি পকেট হইতে একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন

"এইটা দিয়া দেখ, দেখিবে চর্ম্মের লোলতা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া চর্ম্ম প্রশস্ত হইতেছে—"ম্যাগ্নিফাইংগ্লাসটা খুব জোর 'পাওয়ারে'র ছিল—দেখিলাম ডাক্তার শঙ্কর লাল যথার্থবলিয়াছেন—শতবর্ষীয় বৃদ্ধের লোলকুঞ্চিত চর্ম্ম অল্প অল্প প্রসারিত হইয়াছে ; দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম, চর্ম্মের এই অস্পষ্ট পরিবর্ত্তন যাহা আমার ন্যায় যুবক লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল না, তাহা এই বৃদ্ধ কিরূপে নগ্ন চক্ষে দেখিতে পাইল। মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি এত সূক্ষ্ম হইতে পারে ! বাস্তবিক আমার দারুণ লজ্জা বোধ হইতেছিল। এতক্ষণ ডাক্তার শঙ্কর লাল রোগীর নাড়ী ধরিয়া ঘড়ি খুলিয়া বসিয়াছিলেন—আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "শেখর বৃদ্ধের পুনর্জন্ম আরম্ভ হইয়াছে—নাড়ীর গতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, শিশুর নাড়ীর ন্যায় গতি হইয়াছে। "আচ্ছা শেখর তুমি আয়ুর্ব্বেদীয় নাড়ী জ্ঞানের বই পড়েছ" "আজ্ঞে না"—"দেখ এই নাড়ীজ্ঞানটা, আমাদের দেশের একটা প্রকাণ্ড গৌরব কর্ব্বার জিনিস ছিল—কিন্তু এটা পুথিগত বিদ্যা নয় বলে এটার বিশেষ উন্নতি হয় নাই ; পুঁথিতে অবশ্য সবই লেখা আছে, কিন্তু সেটা হাতে কলমে লাগাবার জ্ঞানটুকু খুব অল্পলোকের আছে, তাই বা কেন, কারুরই নেই বলে মনে হয়" "এ সকল প্রসঙ্গে আমার স্বভাবতঃই বড় উৎসাহ আসিত— তাই বলিলাম "হাঁ বুড়োদের মুখে সেকেলে কবিরাজদের আশ্চর্য্য নাড়ীজ্ঞানের অনেক রকম গল্প শুনা যায়", "সে গুলি গল্প নহে শেখর, সত্য ঘটনা—এই যে বায়ু—পিত্ত, কফের 'থিওরী' এটা একেবারে হেসে ওড়াবার ব্যাপার নয়—আর যাঁরা এই নাড়ীজ্ঞানের স্রষ্টা, তাঁরা যে এনাটমী জানতেন না, এ

যারা মনেও কর্ত্তে পারে—তারা বাতুল। তখনকার কবিরাজরা সত্যই নাড়ী ধরে রোগ নির্দ্ধারণ কর্ত্তে পার্ত্তেন; আর এখন এত যন্ত্রপাতি নিয়ে চিকিৎসা করেও যে মৃত্যু সংখ্যা এত বেশী তার কারণ হচ্ছে রোগ ঠিক diagnosis করা হয় না—ভাসা ভাসা চিকিৎসা হয়—তবে পুরাকালে যা ছিল তা নিয়ে গর্ব্ব করাটা আমাদের সান্ত্বনা—তার কারণ, যা ছিল তা রক্ষা করবার জন্য আমরা কিছুই করিনি—বলতে দুঃখে বুক ফেটে যায় শেখর, যে আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়রাই অর্থ লোভে আয়ুর্ব্বেদের ধ্বংস সাধন করছেন; এম্নি উপযুক্ত বংশধর এঁরা। শিক্ষা তো করেননে, তার উপর শিক্ষিতের ভড়ং করে দেশবাসীর নিকট এরূপ একটা অমূল্য চিকিৎসা-প্রণালীকে হেয় করে দিতেছেন।"

এই কথা গুলি এখন মনে হলে ভাবি, তিনি তবু কবিরাজ মশাইদের বিলাতী ঔষধে প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদীয় পেটেণ্ট ঔষধ ও মহর্ষিদের নাম সংযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের ক্যাটলগের ব্যাপার দেখেন নি। বাস্তবিক দেশের লোকে যদি নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজে না করে তো তাদের এত অধঃপতন কখন হয় না। আমার এক ধনী কবিরাজ বন্ধুর "আয়ুর্ব্বেদোদ্যানে" একদিন বেড়াতে গিয়াছিলাম গিয়া দেখিলাম দস্তুরমত একখানি বাগানবাড়ী—ফুল আর ফলের গাছ, মাঝে মাঝে একটা আধটা আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ টবে সাজান, গায়ে টিকিট মারা—একটা গাছ দেখে আমার সন্দেহ হওয়ায় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এগুলি কি ঠিক গাছ" বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "কি জানি ভাই ওসব মাণিকতলার নার্শারী থেকে কেনা" বুঝিলাম বন্ধু আমার ভেষজশাস্ত্রবিৎ বটে—

বাজারের জুয়াচোর বেনে—আনাড়ী বেদেরা যা বন-জঙ্গল হতে এনে দেয়—এঁরা নির্ব্বিকারে তাই থেকে ঔষধ প্রস্তুত করেন। অবশ্য সকলেই যে এই শ্রেণীর তা আমি বলি না—কারণ আমার নিজের কোন আত্মীয়ের অসাধ্য কার্ব্বঙ্কল রোগ, একজন কবিরাজের চিকিৎসায় বিনা অস্ত্রোপচারে সহজে আরোগ্য হইয়াছিলেন; তবে বেশীর ভাগ অর্থাৎ যাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধ বেচিয়া, ক্যাটলগ ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জন করেন তাহাদের সকলের বিদ্যাবুদ্ধি পূর্ব্ববৎ।

"আচ্ছা তুমি এখন স্নানাহার করে এস, আমি ততক্ষণ বসি—তারপর তুমি এলে আমার ছুটী হবে।" বলিয়া আমায় বিদায় দিলেন; আমিও বাহিরে আসিলাম। সত্য বলিতে কি এতদিন কাজটা আমার মনের সঙ্গে বেশ খাপ্ খায় নাই; কিন্তু আজ যেন সেটা বদ্‌লে গেল—কাজটা সত্যই আনন্দপ্রদ হয়ে উঠ্‌ল—। এতদিন ভাবতুম—এ একেবারেই অসম্ভব কাজ, ডাক্তার কেবল খেয়ালের ঝোঁকে পয়সা ও সময় নষ্ট করিতেছেন—কিন্তু আজ বুঝিলাম ডাক্তার সত্যই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন; সারাজীবন তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিয়া শিখিলেও আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারপর তিনদিন ক্রমাগত মালিস চলিল—মালিসটা দুর্গন্ধ হইলেও উপকারী বটে; অত লোল চর্ম্ম ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া শরীরের সঙ্গে যেন মিলাইয়া গেল, তৎপরিবর্ত্তে সুস্থ ও সবল দেহের চর্ম্মের মত মসৃণ ও সুপুষ্ট হইল—পরিবর্ত্তন খুব আশ্চর্য্যই দেখিলাম—মনে আশা হইল যে হয়ত বা বৃদ্ধ সত্যই নবযৌবন ও অমরত্ব লাভ করে—ডাক্তারের স্বপ্ন বা সফল হয়—এই তিনদিন তিনরাত্রির মধ্যে নিদ্রারও অবকাশ ছিল না—সতর্ক প্রহরীর মত ক্রমাগত লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়াছিলাম—আজ বড় ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল—ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "শেখর! খুব কষ্ট হয়েছে না—বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কি কর্ব্ব আমিও বসে নেই—আমাকেও তিনদিন ভারী ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েছে যাক্, এখন তুমি খেয়েদেয়ে শোওগে আজ আর তোমায় কিছু কর্ত্তে হবে না।" আমিও যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—তিনদিনের পর ঘুম—সে যে কত গাঢ়, কত গভীর, কত শান্তিময় তাহা জানাইবার নহে। যখন উঠিলাম তখন সন্ধ্যা, চৈতন্য গৃহিণী একবাটী গরম দুধ আনিয়া দিল—পানে স্নিগ্ধ হইলাম—শরীরে যেন অভূতপূর্ব্ব বল পাইলাম। খাঁটী দুধ পেটে খুব কমই পড়েছে, সুতরাং খাঁটী দুধের আস্বাদন পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। বাঙালীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য হইতে আমরা কেবল আলস্য বশতঃ বঞ্চিত হইতেছি এবং তৎপরিবর্ত্তে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য 'চা' নামক গরম জল পান করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি। আগে এই জিনিসটী

সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য ছিল—তখন বঙ্গের প্রতি গৃহে গাভী থাকিত। হিন্দুর ঘরে গাভী না থাকিলে, তাহা হিন্দুগৃহ বলিয়া পরিগণিত হইত না—এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, তাই দুধ কিনিয়া খাই—তা সে যে দুগ্ধরূপী বিষ তাহা জানিয়াও খাই—কারণ উপায় নাই। এখন হিন্দুর গৃহে গাভী অদৃশ্যমান। গাভীর দুগ্ধ মধুর হইলেও আজকাল হিন্দুর কুললক্ষ্মীগণ গো-সেবায় পরাঙ্মুখী। সভ্যতার হাওয়া অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছে, যে হাতে সুগন্ধি সাবান এসেন্স মাখা হয়—যাহার কর্ম্ম পটুতা বড় জোর পানের বাটার সীমানা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট,—সে হাতে খড় কাটা, গরুর জাব দেওয়া, ঘুঁটে দেওয়া কি লজ্জাকর। এ সব বলিয়া ফল কি? এ সব দুঃসাহসিক উপদেশ দিতে আস কে তুমি—এত সাহস তোমার কিসে—হে মরণোন্মুখ অশীতিপর বৃদ্ধ, তুমি কি সভ্যতালোক প্রাপ্তা-নারীর ভ্রূভঙ্গীকে ভয় কর না—পালাও পালাও তোমার সেকেলে গোঁড়ামী লইয়া এইদণ্ডে নিষ্ক্রান্ত হও নতুবা সভ্যা বাঙ্গালিনীর কোপ কটাক্ষে পড়িয়া অচিরে ভস্মীভূত হইবে—আর তোমার দুর্নীতিপ্রচারী উপন্যাস মহিলা মহলে বয়কট হইয়া যাইবে। আমরা জন্ম জন্ম এরারুট ও চিনি মিশান কলের জল তিনসের করিয়া কিনিয়া খাইব, তথাপি গৃহিণীকে গোসেবার ভার লইতে বলিবার সাহস হইবে না—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ডাক্তারী ছাড়িয়া খড় কাট; আমাদের তাতে আপত্তি নাই।" এই তো নব্য বাঙালীর উক্তি—এই তো স্ত্রীশিক্ষার ফল, কিন্তু কেন এমন হয়—আমাদের দেশের মাটীতে কি আছে, যাহার দোষে সব বিগড়াইয়া যায়—স্ত্রী শিক্ষা বস্তুতঃ তো খারাপ নয়—বরং স্ত্রীলোকদের অশিক্ষিত রাখাই দোষের কথা, কিন্তু শিক্ষা মানে কেবল বই পড়া নয়; খালি বই

পড়িয়া শিক্ষা হয় না—শিখাইবার মত শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালীর অভাবে শিক্ষা যে কুশিক্ষায় পরিণত হইয়া গরল উৎপাদন করিয়া বাঙালীর পুণ্যসংসার নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহা হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে। দুখানা বহি পড়িয়া যদি গৃহকর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হয়, তবে সে পড়ার চেয়ে না পড়াই কি ভাল নয়—শিক্ষায় যদি কর্ত্তব্য জ্ঞান না বাড়িয়া কমিয়া যায়, যদি সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়, তবে সে শিক্ষায় ধিক্। এই অভিনব বিলাতী স্ত্রীশিক্ষা যাহার সার্থকতা কেবল উল বোনা—ক্রসেট বোনা—না হয় দুখানা উপন্যাস পড়া, বস্তুতঃ তাহার মূল্য কি? মূল্য আছে বই কি—আমি ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ বলিয়া তাহা দেখিতে পাই না—ঐ যে আমার সহৃদয় বন্ধু নবীন যুবক চশমার ভিতর দিয়া তাঁহার ঝাপসা চাহনীতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন "নইলে বাংলা ভাষার উন্নতি হইত কি করিয়া—অল্প হোক আর বেশী হোক 'সু' হউক আর 'কু' হউক—এই যে ।৶০ ॥০ ৸০ ১৲ প্রভৃতি বহুবিধ সংস্করণের বস্তা বস্তা উপন্যাস বাহির হইতেছে তাহা খরিদ করিত কে? বঙ্গ মহিলা শিক্ষিতা না হইলে দেব চরিত্র মোটর চালকের সহিত উচ্চ শিক্ষিতা মহিলার অবাধ প্রেমের ছবি দেখাইত কে? ইহা কি বঙ্কিম চাটুয্যের কাজ? বঙ্গমহিলা শিক্ষিতা না হইলে উপন্যাসে বেদ বেদান্তের ব্যাখা করিয়া এই পাপিষ্ঠ বাঙ্গালী জাতিকে বিনা তপস্যায় কেবল উপন্যাস পাঠদ্বারা স্বর্গফল লাভ করাইত কে? এই যে বড় বড় রাজনীতির সভা হয়, শিক্ষিতা বঙ্গ মহিলার কলকণ্ঠনিনাদিত স্তবসঙ্গীত লহরী উত্থিত না হইলে তাহা জমিত কি করিয়া; আর সর্ব্বোপরি তোমার এই পুস্তককে কীটদংশন হইতে রক্ষা করিত কে—অকৃতজ্ঞ!

বর্ব্বর!" থাক্, এইখানে থামিতেছি, আমি ভীমরুলের চাকে আর খোঁচা দিব না; বরং কবি সম্রাটের স্থললিত সঙ্গীতের দুই লাইন উদ্ধৃত করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি,

"ওগো তোমরা সবাই ভাল
কেউ দিব্য গৌর বরণ কেউ দিব্য—"

আর বলিলাম না—একেত কালো বলিয়া বাঙালী জাতি বিখ্যাত; যদি চ আফ্রিকায় ও আমেরিকায় আমাদের চেয়ে গাঢ়বর্ণের জাতি বিদ্যমান—তথাপি খ্যাতিটা আমাদের একচেটিয়া; একেই বলে যশঃভাগ্য। তার উপর আমাদের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাঙ্গিনীদের উপর সে খ্যাতির ভার চাপাইয়া বিদ্বেষ উৎপাদন করিতে আর আমি প্রস্তুত নহি।

দুগ্ধপান করিয়া রোগীর কক্ষে যাইবামাত্র "এসেছ শেখর, দেখ দেখি এখন অবস্থা কেমন—আমি নাড়ী দেখিয়া বলিলাম "বেশ, নাড়ীর গতি অনেক সবল হয়েছে।" "তা হলে এবার আর রাস্তা ভুল হয়নি বলে মনে হচ্ছে—যাক্ আজকে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগ করে শরীরের রক্ত বৃদ্ধি করে দিতে হবে, তাহলে যৌবনের রক্তাভা শরীরে দেখা যাবে; আর এক সপ্তাহ পরে একে জাগান যেতে পারবে—এই যে যোগনিদ্রাই বল আর Hypnotised stage বল, এটা নড়া চড়া বন্ধ রাখাই উদ্দেশ্য—তাতে আমাদের কার্য্য কবার সুবিধা হয়, আর রোগীও কোনরকম বৈলক্ষণ্য অনুভব করে না।" এই বলে তিনি রোগীর সর্ব্বাঙ্গে এক খানা খুব কাল অথচ মিহি রেশমী কাপড় জড়াইয়া দিলেন—সর্ব্বাঙ্গ সুচারুপে আবৃত হইলে সেই কাপড়ের উপর চুলের মত সরু তাঁবার তার দিয়া তাহা ব্যাটারীর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াদিলেন—আমায় বলিলেন ঘড়ি

ধরিয়া থাক, পাঁচমিনিট হইলেই কনেকশন্ খুলিয়া দিবে—আমি তাহাই করিলাম। তারপর রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন আজ আর বিশেষ কিছু করিবার নাই; মাঝে মাঝে কেবল ঘরের হাওয়ার তাপ লক্ষ্য করিবে, বলিয়া তিনি চলিয়া-গেলেন। আমি প্রদীপের স্তিমিত আলোকে রোগীর পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—হঠাৎ যেন মনে হইল, সেই রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে অতি সামান্য রক্তাভা ফুটিয়া উঠিতেছে—যৌবনের অরুণিমা যেন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে—আমি স্তম্ভিত হইলাম। ডাক্তার শঙ্কর লালের সাধনার সিদ্ধি লাভ আরম্ভ হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার অজ্ঞাতসারে আমার চোখ দিয়া দুফোঁটা জল মাটীতে পড়িল—একি আনন্দের অশ্রু, না ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে ডাঃ শঙ্করলাল আসিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন—বলিলেন "শেখর, বুঝতে পাচ্ছ-আমি নেহাইৎ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম না, দেখ মানুষ যতক্ষণ না সিদ্ধি লাভ করে, ততক্ষণ তার সাধনা লোকের কাছে উন্মত্ততা বৈ আর কিছু বলে বোধ হয় না, তার কারণ কি জান, তার ধ্যানের জিনিষটীর ভিতরদিকে তার সমস্ত সত্ত্বা চলে যায়, কাজেই তখন সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকে—বাহিরের লোকের সঙ্গে সে যা বলে বা করে

তাতে তার নিজের বলে কিছু থাকে না—সে কেবল বাইরের সঙ্গে ভাসা ভাসা সম্পর্ক রাখে, কিন্তু মন তার ডুবে থাকে কাজে—কাজেই বাহিরের লোকে তাহার ব্যবহার অসংযত দেখে, তার উক্তি অসংলগ্ন ভাবে—কিন্তু সে যে কি, তা সেই জানে; আর তার মন জানে—কি বিপুল আনন্দ সে উপভোগ করে; সেইজন্যেই লোকের ভাল মন্দ বলায় তার বেশী আসে যায় না—আর এই ঐকান্তিক সাধনা যদি কোন কারণে, কোন সামান্য ক্রটীতে বা ভূয়োদর্শনের অভাবজনিত অক্ষমতায় বিফল হয়, তবে সে সত্যই উন্মাদ হয়ে যায়—কারণ পৃথিবীতে তার একমাত্র ভালবাসার জিনিসটী যেন মরে যায়—ঈশ্বর না করুন এবারে যদি আমি বিফল হই, তা হলে শেখর সত্যই আমি উন্মাদ হয়ে যাব; তখন আমার সৌর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান কিছুতেই আমায় অচল রাখতে পারবে না; কারণ আমিও তো মানুষ—এই পঞ্চাশ বৎসর জ্ঞানের পেছন পেছন ছুটে এসে যদি দেখি জ্ঞান মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, তখন কি বলে মনকে প্রবোধ দেব?" আমি সহাস্যে বলিলাম "সে আশঙ্কার তো আর কারণ নেই—রোগী পুনর্জীবন পেয়েছে কি না জানি না, তবে পূর্ণ যৌবন তার শরীরে জেগে উঠেছে।" তার চিহ্ন আমিও দেখছি কিন্তু বেশী আশা করো না শেখর, মরবার সময় গাছে জল দিলে তাতেও দু একটা ছোট ছোট অঙ্কুর দেখা যায় কিন্তু শক্ত হচ্ছে তাকে বাঁচান—আজ থেকে ৩।৪ দিন আমাদের লক্ষ্য আর ও সতর্ক কর্ত্তে হবে; এই সময় একটি ভুলে একেবারে সর্ব্বনাশ হতে পারে। খুব সাবধান কোন কারণে যেন রোগীর শরীরের তাপ আর না বাড়ে, ৫ মিনিট অন্তর থার্ম্মমিটার দিয়ে টেম্পারেচার নেবে; যদি টেম্পারেচার এক পয়েন্ট ও বাড়ে তখনি

আমায় ডাকবে—আর কোন কারণে রোগীর কাছ ছাড়া হইবে না—এখন আমি বসে আছি, তুমি স্নানাহার করে নাও; তুমি এলে আমি উঠ্‌ব।" কার্য্যের সফলতাজনিতই হউক বা যে কারণেই হউক মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল, তাই সারারাত্রের নিদ্রায় আমি বিশেষ কষ্ট বোধ করি নাই বরং একটু বেড়াইবার ইচ্ছাই হইতেছিল সুতরাং চৈতন্‌দাকে পাকড়াও করিয়া কালী মন্দিরের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলাম—সালোয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল—আমাদের দিকে একটা শাসন সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বোধ হয় সেদিনের দিব্য লঙ্ঘন করিতে ছিলাম, সেটা জানাইয়া দিল—আমরা দুজনে লাঠি হাতে করিয়া সেই বনপথে; সরু রাস্তাটুকুতে আস্তে আস্তে যাইতেছিলাম। নিদাঘের মধুর প্রভাত, বালসূর্য্য-কিরণে ধরণী যেন হাসিতেছিল, গাছের সবুজ পাতার বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহারা বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুবিধা না পাইয়া যেন পাতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পড়িতেছিল। কয়দিন বনপুরীতে বাস করিয়া ব্যাঘ্রগর্জ্জন বিভীষিকা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় আজ সাহসে কুলাইল, আর প্রাতে পশুরাজগণ সারানিশি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া সম্ভবতঃ একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিবেন এ রকম একটা ধারণা ও উৎসাহের অন্যতম কারণ ছিল। প্রায় পোয়াটাক পথ অতিক্রম করিতেই দূর হইতে মন্দিরের ভগ্ন চূড়া দেখা গেল, চৈতন্‌দা ভক্তিভরে উদ্দেশে একটী প্রণাম করিয়া বলিল 'দাদাবাবু ঐ মায়ের স্থান" আমি ও তাহার অনুকরণে একটী প্রণাম করিলাম।

মন্দিরটী এককালে খুব জমকালো ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ

রহিয়াছে সুতরাং এ মন্দিরের স্থাপয়িতা কোন রাজা না হউন, রাজা বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন; তাহা অনুমান করিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। তবে এখন অবস্থা বিশেষ শোচনীয়, মন্দিরের চতুঃপার্শ্বের চত্বর খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, উপরিভাগে বিবিধ বৃক্ষ রাজী বেশ সতেজে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং খিলান ভেদ করিয়া রাশি রাশি শিকড় ভিতরে ঝুলিতেছে। ভিতরে পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি; দেবতা এতদিনের অনাহার সহ্য করিয়া, মাঝে মাঝে কে ভক্ত সন্ন্যাসী আসেন তাহার আশায় এখনও বিগ্রহে আছেন কি না জানি না—তবে মূর্ত্তি দেখিলে যুগপৎ ভক্তি ও ভয় হয়। এরূপ মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় না এবং ইহার শিল্পীও যে সাধারণ নহে তাহা গঠন প্রণালী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পন্ন-শোভা (Finish) দেখিয়া বুঝা যায়—মরি মরি কি বরাভয়করমূর্ত্তি! দেখিলেই যেন ভক্তিতে নত হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

"চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষিতা
খড়্গাঙ্ক দক্ষিণে পানৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্॥

ভাবিলাম এতশক্তিশালিনী মায়ের সন্তান হইয়া আমরা এত শক্তি-হীন কিসে হইলাম? সমগ্র জগতে শক্তির এমন প্রকট, এমন ভীষণ অথচ মধুর, এমন সংহার ও সৃজনের একীভূত মূর্ত্তিতো নাই! এমন মায়ের সন্তানেরা কোন পাপে কণামাত্র শক্তিরও অধিকারী হইল না—আবার প্রণাম করিলাম। অদূরে কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, চৈতন্ত তাহা দেখিয়া বলিল দাদাবাবু, ঠাকুর বোধ হয় এসেছেন, নইলে এখানে কে আগুন জ্বাললে; বাস্তবিক সেই ছাই দেখিয়া বোধ হইল আজকালই যেন কেহ তাহা জ্বালাইয়াছে। একবার দেখ্‌তে হল, বলিয়া "বাবা ঠাকুর,

লেংটা বাবা” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না, চৈতন্য চিন্তিত হইল ; বলিল “দাদাবাবু—একবার দেখতে হচ্ছে তো, ঠাকুর এলো তো গেল কোথায় ? ফিবারে এসে আমার ওখানে পায়ের ধুলা দেন, আমি সেবার জন্য দুধ দিয়ে যাই ; কিন্তু এবারে এমন হোল কেন ? আসুন তো আশপাশগুলো দেখি—” দুজনে মন্দিরের চারিপাশ দেখিলাম—কোথাও মানবের অস্তিত্ব চিহ্ন নাই। “না, তাহলে বাবাঠাকুর আসেন নি—তিনি এসে মন্দিরেই থাকে অন্য কোথাও তো যায় টায় না। আমি কৌতুক করিয়া বলিলাম “তোমার ঠাকুরকে বাঘে ধরে নিয়ে যায় নি তো চৈতন দা” “কি যে বল দাদাবাবু তার ঠিক নেই, বাঘ তো বাঘ স্বয়ং যমরাজেরও সাধ্যি নেই যে তাঁর কাছে ঘেঁসে—তিনি যে পিচেশসিদ্ধ ; তিনি কি তোমার আমার মত মানুষ গা” ? “বটে ! তা আমি কি করে জানব বল, আমি মনে করেছিলুম এই যে সব সন্ন্যাসী চিমটা হাতে করে বেড়ায় ভিক্ষাও করে আবার ফুরসৎ পেলে চুরি ডাকাতিও করে, তিনি সেই রকম” “ছিঃ ছিঃ ও কথা বলোনা, দাদাবাবু বলিয়া সেই অজ্ঞানিত পিশাচসিদ্ধ মহাপুরুষের উদ্দেশে নাক কাণ মলিল, উদ্দেশ্য মৎকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। একটা দেখাবার জিনিস এই অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অন্ধ বিশ্বাস—আমরা সভ্য হয়ে, ভগবানকে নিয়ে তর্ক বিতর্কের ছুরি চালিয়ে তন্ন তন্ন করে ব্যবচ্ছেদ করে কিছু খুঁজে পাইনা—শেষ যেন সবই গোলমাল হয়ে যায় ; কিন্তু এই অশিক্ষিত পৌত্তলিকেরা কি রকম করে কত সহজে তাঁর সত্ত্বা অনুভব করে তা সত্যই বিস্ময়ের বিষয় ; তাই বলে “বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।” যাই হোক বাবাঠাকুরের উদ্দেশ না

পাইয়া চৈতন্ত বড় ক্ষুন্ন হইল কিন্তু এই নিবিড় নির্জনে আসিয়া আগুন জ্বালিল কে? সেইটা আমার বড় চিন্তার বিষয় হইল। ফিরিবার সময় মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগদিয়া অপরপথে আসিতেছিলাম—এপথটা কণ্টক বৃক্ষা-কীর্ণ, ও একান্তই দুরধিগম্য, তবুও সেই পথ অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য যদি বাবাঠাকুরের কোন নির্দ্দেশ হয়। একটু আসিতেই দেখি ঘন গুল্মান্তরালে দণ্ডায়মান এক মনুষ্যমূর্ত্তি—বনের পাতার ফাঁকদিয়া তাহার দানবী-দীপ্তিসম্পন্ন অক্ষিতারকাদ্বয় জ্বলিতেছে, আমাদের দেখিয়া হি হি হি করিয়া বিকট হাস্য করিয়া সে মন্ত্রবলে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল! দেখিয়াই বুঝিলাম এ সেই সন্‌ফিউ—সেই দুর্দ্ধর্ষ প্রতি-হিংসা-পরায়ণ চৈনিক। ডাক্তার শঙ্কর লালের এত যত্ন, এত সতর্কতা, বিফল করিয়া, কি করিয়া যে এই বীভৎস জীব এত দূরে অনুসরণ করিয়া আসিল, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। চৈতন্ত বলিল "দাদাঠাকুর গতিক তো ভাল নয় ওটা পিচেশ্‌—মা কালীর অনেকদিন পূজা হয় নি, তাই বোধ হয় আমাদের কাছে চর পাঠিয়েছেন।" আমি বলিলাম "ক্ষেপেছ চৈতন দা—পিচেশ কি আগুন জ্বালে" "কি জানি বাবু কিছু তো বুঝতে পারি না—" যাই হোক আসল কথাটা আর ভাঙিলাম না—তবে আগুন যে কে জ্বালাইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারকে ব্যাপারটা বলিলাম; তিনি শুনিয়া যেন বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইলেন, বলিলেন "ওঃ কি দারুণ প্রতিহিংসা! এখানেও আসিয়া পৌঁছিল আর কিন্তু সুবিধা নয় শেখর; এখন থেকে খুব সাবধানে থাকৃতে হবে—তুমি পিস্তল ছুঁড়তে জান? "আমি বলি-লাম কখন ছুঁড়ি নাই, তবে পাখীমারা বন্দুক দু'একবার ছুঁড়িয়াছি—

দেখাইয়া দিলে পারিব—" "শোন, বলিয়া তিনি উঠিয়া নিজের কক্ষে গিয়া একটা রিভলভার আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন "এতে সাতটা টোটা ভরা আছে—খুব সাবধানে রাখবে—যদিও ঠিক লক্ষ্য কর্ত্তে না পার—তাকে এই বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখিলেই আওয়াজ করিবে, তারপর আমি আছি; এখন যাও তুমি আর বিলম্ব করোনা—আহারাদি করে একটু বিশ্রাম করে নাও গে—আজ থেকে আবার দুশ্চিন্তা বাড়লো" দেখিলাম সত্যই তাঁহার মুখ চিন্তাভার গ্রস্থ; দেখিলাম, দারুণ পরিশ্রমে, উৎকট মানসিক চিন্তায় ও উদ্বেগে এই কয় দিনে তাঁহার শরীরে দৌর্ব্বল্যচিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে—আমার বড় কষ্ট হইল, বলিলাম, "দেখুন আপনার শরীর তত ভাল বোধ হচ্ছে না—আমি ছেলে মানুষ আমার উপর খাটুনীর বেশী ভার দিয়ে, আপনি একটু বিশ্রাম নিন্" "বিশ্রাম—বিশ্রাম আমার জন্য সৃষ্টি হয় নাই শেখর, তবে বিশ্রাম নেব, যদি আমার ব্রত সফল হয়—আমার কিছু হয় নি—তুমি ভেব না—আমার শরীর পাথর দিয়ে তৈরী করা—পরিশ্রম চিন্তা, উদ্বেগ—এরা আমার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—পারে যদি সে এক ব্যর্থতা।" আমি বুঝিলাম ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য—সে দেহ সত্যই লৌহ-গঠিত—আমাদের মতন দশটা যুবকের তেজ; উৎসাহ, সে বার্দ্ধক্যের তুলনায় অনেক লঘু।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ঠিক বারটার সময় আমি আসিয়া ডাক্তারকে খবব দিলাম; রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে, তাহাও বেশ বুঝিলাম—তাপ লওয়া, বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্থিরতা রক্ষা করা, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা রক্ষা করা, প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই ঠিক নিয়মমত চলিতেছিল—রোগীর হস্তপদাদি বেশ পরিপুষ্ট ও সবল হইয়াছে। জরার সে জর জর ভাব আর মোটেই নাই বার্দ্ধক্যের স্মৃতি রহিয়াছে দেখিলাম—পক্ককেশ, নতুবা শারীরিক চিহ্নে যৌবনভাব প্রকটিত হইতেছিল—তবে রোগী তখনও মোহাচ্ছন্ন! আজকে একটা নূতন জিনিষের অস্তিত্ব দেখিলাম,এটা একটা ঝাঁপি; সাপুড়েরা যেমন ঝাঁপিতে সাপ ধরিয়া রাখে সেইরূপ বাঁশের বোনা ঝাঁপি, উপরে অনিপুণহস্তে গোময় ও মৃত্তিকা লিপ্ত। একবার ভাবিলাম খুলিয়া দেখি ইহাতে কি আছে—কিন্তু ডাক্তার শঙ্কল লালের কার্য্য প্রণালী এত অদ্ভুত, যে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া শেষে হিতে বিপরীত সাধন করিব এই আশঙ্কায় ঔৎসুক্যদমন করিলাম—পরে বুঝিলাম ভালই করিয়াছিলাম নতুবা সেই দিনই সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইতাম।

ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে ডাক্তার শঙ্কর লালের আসিবার আর আধঘণ্টা বাকি। আধঘণ্টা পরেই ঘুমাইবার ছুটী পাইব, আবার রাত্রি ১২টায় উঠিয়া এই প্রহরায় নিযুক্ত হইতে হইবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হইতেছে দেখিয়া দীপ জ্বালিলাম—এ সেই পুরা কালের

এরণ্ড তৈলের প্রদীপ—যাহা আজকাল লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই দীপের মৃদু আলোকে যে একটা কি স্নিগ্ধতা আছে তাহা এখন কলিকাতার "বিজলী বাতি" ব্যবহারে বুঝিয়াছি, আর তখন ভাবিতাম এ প্রথাটা কি কদর্য্য—কি অসভ্যতার চিহ্ন! যদি কোন রকমে পূর্ব্বপুরুষের এই অসভ্য আলোকটীর আজ ব্যবহার থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আজকাল এত উপচক্ষুর (চশ্‌মার) প্রাদুর্ভাব হইত না। বিজলী আলোক সুলভ, সুন্দর, পরিষ্কার বটে কিন্তু সে যে সকলকে অজ্ঞাতসারে সম্মোহিত করিয়া মানবের দৃষ্টি-শক্তি অপহরণ করিয়া মানবকে অকালবার্দ্ধক্যজাত দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য দানকরে, তাহা অবধান করিবার অবকাশ আমাদের নাই—আমরা আলোক পাইয়া অগ্রসর হইতেছি, এদিকে যে জীবনালোক ধীরে ধীরে নির্ব্বানোন্মুখ সে দিকে লক্ষ্য নাই। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোক রোগীর মুখে পড়িয়া একটী মৃদুসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছিল—সেই পক্ককেশী-যুবক-রোগীর মুখখানি আমার মনে কতরকম অসংলগ্ন চিন্তা আনিতেছিল—এমন সময় হঠাৎ বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদে ঘর ভরিয়া উঠিল—আমার মাথা ঘুরিয়া গেল—এ যে সালোয়ার কণ্ঠস্বর—মূহুর্ত্ত-মধ্যে তাহার কক্ষের দিকে ছুটিয়া গেলাম—দেখিলাম, সালোয়ার কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ—যেটা সর্ব্বদাই আবদ্ধ থাকিত—তাহার দ্বার পথে মূর্চ্ছিতা সালোয়া, আর কক্ষের দ্বার সম্মুখে প্রদীপহস্তে দণ্ডায়মান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চৈতন্য। আমি বসিয়া পড়িয়া সালোয়ার মাথা কোলে তুলিয়া লইলাম; চৈতন্যকে তদবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম—"রাস্কেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? শীগ্‌গির জল

আর পাখা নিয়ে আয়—স্ত্রীহত্যা হয় দেখছিস্!" সে অভিভূতের ন্যায় ছুটিয়াগেল, হঠাৎ আমার দৃষ্টি সেই উন্মুক্ত দ্বার পথে—কক্ষ মধ্যে পড়িল—দেখিলাম—ওঃ সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কক্ষের চারিপাশে দেওয়ালের সঙ্গে লোহার খাঁচার পিঁজরা তাহার মধ্যে বিবিধ রকমের বীভৎস জীব রহিয়াছে—সব অবশ্য দেখিতে পাই নাই—তবে দু একটা যা দেখিলাম তাতেই রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল—সামনেই একটা দুটা মাথাওলা মানুষ রহিয়াছে, তার পাশে ডানদিকের খাঁচায় একটী মনুষ্যাকৃতি বনমানুষ বিরাট দ্রংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, কোনের দিকে, দুটো মানুষ একত্রে জুড়িয়া গেলে যেমন দেখিতে হয়, সেইরূপ এক অপরূপ জীব দাঁড়াইয়া দুই-হাতে রেলিং ধরিয়া খল খল করিয়া হাসিতেছে—কক্ষের অভ্যন্তর হইতে একটা বিকট ধ্বনি আসিতেছে—হঠাৎ একদিনের কথা মনে পড়িল সে দিন কি জন্য শুনিয়াছিলাম "চৈতন জানোয়ারদের খাবার খাওয়াতে গেছে" এতক্ষণে সমস্ত ঘটনাটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল—অনব-ধানতা বশতঃ দ্বার খুলিয়া সে এই জীবদিগকে সান্ধ্যাহার দিতে আসিতে-ছিল, সালোয়া অন্যমনস্কে হয়ত রান্নাঘর হইতে নিজের কক্ষে আসিতে অন্ধকারে এই কক্ষে ঢুকিয়া বিভীষিকা দেখিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হয়। চৈতন্য পাখা হাতে করিয়া আসিলে—আমি তাহার মাথায় জল দিলাম—চৈতন্য হাওয়া করিতে লাগিল—এই সমস্ত ঘটনা বলিতে যা সময় লাগিল ঘটিতে বস্তুতঃ তাহার শতাংশ সময়ও লাগে নাই—সালোয়া চৈতন্য পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "ডাক্তারবাবু—ওঃ আপনি—কি ভয়ানক" আমি তাহার ললাটস্থ চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিয়া

রুমাল দিয়া জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলাম "ভয় নেই সালোয়া —আমরা থাকৃতে—" "ষ্টুপিড্, কার হুকুমে তুমি রোগী ফেলে হেথা এসে ভালবাসা দেখাচ্ছ" বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় এই কয়েকটী কথা আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল—সালোয়াকে ফেলিয়া আহত ভুজঙ্গের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম—চৈতন্যের স্ত্রী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মাথায় জল দিতে লাগিল—দেখিলাম সম্মুখে দণ্ডায়মান, ক্রোধে-কম্পমান ডাক্তার শঙ্করলাল। তাঁহার সেই দীর্ঘায়তন দেহ ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া যেন আরও দীর্ঘ হইয়াছে, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, চক্ষু দিয়া ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় তীব্র শিখা নির্গত হইতেছে—আমিও ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, চীৎকার করিয়া বলিলাম "আমি চাকৃরী কর্ত্তে এসেছি বলে, আমার স্ত্রী হত্যা হবে তবুও দেখ্‌তে আসব না এমন দাসখত লিখে আমি দিই নি, আমি চাই না তোমার চাকৃরী" "বটে, এত তেজ! যখন খেতে না পেয়ে কুকুরের মত রেঙ্গুনে পরের বাড়ীতে পাতা চাট্‌তে—তখন এ তেজ কোথায় ছিল! স্ত্রী, কার দৌলতে স্ত্রী পেয়েছিস হতভাগা, তবু এখনও স্ত্রী হয় নি— আমার রোগীর যদি একটুও ক্ষতি হয় জানিস্ তোকে কুকুরের মত গুলিকরে মেরে ফেলবো" বলিয়া আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিয়া এমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন—ওঃ কি সে দৃষ্টি যেন বজ্রের মত মর্ম্মভেদী, আমি আর চোখে চোখ রাখতে পারলুম না—আমার হাত পা কাঁপিতে লাগিল, আমিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। মানুষের চোখে এত তেজ থাকে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম—আমি রোগীর কক্ষের সম্মুখের দালানে শুইয়া আছি, চারিদিক অডিকলোনের গন্ধ ভরা—ডাক্তার শঙ্করলাল আমায় কোলে করিয়া নিজে হাওয়া করিতেছেন—সেখানে অন্য কেহ নাই। "জ্ঞান হয়েছে শেখর!—কোন কষ্ট হচ্ছে না" স্বর স্নেহ-সুধাধার-সিঞ্চিত, কোথায় সেই ঘাতকের মত কণ্ঠস্বর, সেই পৈশাচিক দৃষ্টি, আর কোথায় অমৃতনিঃষ্যন্দিনী সুধাধারাবিগলিত বাৎসল্যরসাপ্লুত করুণ কণ্ঠস্বর। এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ডাক্তার বলিলেন "আমি জীবনে আজ প্রথম সংযম হারিয়েছি শেখর! এজন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত তুমি আমার পুত্রাধিক প্রিয়; পরম স্নেহের পাত্র, তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইছি—তুমি আমায় মাপ্ করো।" এর উত্তরে ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না—আমার অত ক্রোধ, অত দারুণ ঘৃণা, যেন এই অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অমৃতময় স্নেহরসে দ্রবীভূত হইয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছিল—আমি অশ্রুরুদ্ধ, ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলাম "আপনার তো দোষ নেই ডাক্তারবাবু—দোষ আমারই—আমিই প্রেমান্ধ হয়ে কর্ত্তব্য ভুলে এসেছিলুম—" "ভালই করেছিল—নইলে কি সালোয়া বাঁচত শেখর! আর সে যদি না বাঁচতো তাহলে দুর্গাদাসকে বাঁচান যে আমার নিস্ফল হতো—সে হয় ত পুনর্জ্জীবন পেয়েও সালোয়ার শোকে পাগল হয়ে যেত—ভগবান যা করেন সত্যই তা মঙ্গলের জন্য—দেখ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আর একটা অধর্ম্ম বা পশু প্রবৃত্তি থাকে—এই দুটোয় পরস্পর যুদ্ধ চলে—আর যে প্রবৃত্তি দুর্ব্বল থাকে তার উপর

অপরটা আধিপত্য বিস্তার করে তাকে নিজের মতে চালিয়ে নেয়—তবে মানুষ যেমনই হোক, সকলের শরীরে এই দুটী জিনিস বর্ত্তমান আছে—যদিও আজীবন সন্ন্যাসে, সংযম দ্বারা আমার পশু প্রকৃতিটাকে অত্যন্ত দমনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার রোগীর অনিষ্টের আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনব্যাপী প্রচণ্ড চেষ্টার ব্যর্থতা জেগে উঠে আমাকে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞানহারা করিয়াছিল; তাই সেই আজীবনের রুদ্ধ পাশব বৃত্তি সচেতন হইয়া আমার মনের উপর হঠাৎ প্রভূত আধিপত্য লাভ করে আমাকে পশুরও অধম করে তুলেছিল—কিন্তু ভগবান রক্ষা করে-ছেন; সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) অনুশীলন করায় আমার দৃষ্টির সম্মোহন শক্তি তোমায় মূর্চ্ছিত করে ফেলেছিল—তোমায় মূর্চ্ছিত দেখে আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইলাম। নইলে সে রাগের ঝোঁকে সত্যই যদি গুলি কর্ত্তুম, তাহলে আমার রোগীরও শেষ হ'ত আর অনু-তাপে হয় ত নিজেকেই নিজে গুলি কর্ত্তুম।" ডাক্তার শঙ্করলালের এই মর্ম্মভেদী অনুতাপের করুণকাহিনী আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল; অনুতাপ-সন্তপ্ত-কণ্ঠে "রোগীর কিছু অনিষ্ট হয়নিতো ডাক্তারবাবু" বলিয়া উঠিয়া বসিলাম। "একটু হয়েছে বৈকি—তুমি ছুটে বেরবার সময় তোমার পায়ে লেগে—দরজার পাশে ষ্টোভটা বোধহয় উল্টে পড়ে-গিয়াছিল, কাজেই ঘরের তাপ কমে গিয়েছিল এবং রোগীর টেম্পারেচার একডিগ্রী কমে গেছে, তবে খুব আশঙ্কার কারণ নেই—আমি আবার সব ঠিক করে দিইছি—দেখ দেখি একবার টেম্পারেচার। আমার শরীরে কোন গ্লানি ছিল না—সহজেই ঘরে গিয়া টেম্পারেচার লইয়া দেখিলাম তখনও প্রায় পৌনে এক ডিগ্রী কম, "যাহক কোন ভয় নেই আবার

যখন সিকিডিগ্রী উঠেছে, তখন আর একটু চেষ্টা করলে ওটা সেরে নিতে পারবো"—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন আমি ঘরের ভিতর থেকে বসিয়া সালোয়ার চীৎকার শুনিয়াছিলাম—তখন একটা ঔষধ ডিষ্টিল করিতেছিলাম (চোয়াইতেছিলাম) সেটা ফেলিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব—অন্ততঃ পাঁচ মিনিট অতীত না হইলে নড়া আমার পক্ষে অসম্ভব—ঐ ঔষধটী আবার আজ রাত্রেই দিতে হইবে—পাঁচ মিনিট পরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তুমি সালোয়াকে কোলে করে বসে রয়েছ—কাজেই এদিকের জন্য নিশ্চিন্ত হলেও আমার দুর্ভাবনা আমাকে ঘাড় ধরে রোগীর ঘরে টেনে আন্‌লে—এসেই দরজার গোড়ায় ষ্টোভটা ওল্টানো দেখে ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল—ছুটে এসে টেম্পারেচর নিয়ে দেখলুম একডিগ্রী কম, তাড়াতাড়ি ব্যাটারী চালিয়ে দিয়ে ষ্টোভটা ঠিক করে দিলুম, ভাবলুম রোগীর আর আশা নেই; সুতরাং সেই দারুণ নিরাশা যে আমাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বরের মত আচরণ করাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাক্ মঙ্গলময়ের কৃপায় সব দিক রক্ষা হয়েছে, সালোয়ার আর কোন অসুখ নেই তুমি নিশ্চিন্ত হও—ইচ্ছা কর বরং একবার নিজের চোখে তাকে দেখে এসো—যত নষ্টের মূল ঐ বোকা চৈতন্‌টা, হতভাগা যদি দরজটা খুলে না রাখতো তো কোন গোলযোগই হত না—আমি তখন আর কোনরূপ অসুস্থতা দুর্ব্বলতা বা মানসিক উত্তেজনাজনিত অবসাদ অনুভব করিতেছিলাম না—বরং এই কথায় ঐ অপূর্ব্ব জীবজন্তুগুলির কথা মনে পড়ায় জিজ্ঞাসা করিলাম "ডাক্তারবাবু ও জন্তুগুলি ও ঘরে পুরে রেখেছেন কেন" হাসিয়া শঙ্করলাল বলিলেন "শেখর এই বুড়োটার জীবনে যে কত রহস্য লুকান

আছে তা জানলে আর ও কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে না—ওগুলি আমার মানবজীবন-বিজ্ঞান-চর্চ্চার উপকরণ—ওগুলি হচ্ছে অসম্পূর্ণ সংস্করণের মানব, ওদের ভিতর যা অসম্পূর্ণতা—যা অভাব—যা ত্রুটী আছে অর্থাৎ যে কারণে ওগুলি মানুষ হতে হতে ঐ রকম অদ্ভুত জীব হয়ে গেছে—সেই কারণগুলি আলোচনা করে, তা দূর করে, ঐ গুলিকে পূর্ণমনুষ্যত্ব দান করবো এই আমার উদ্দেশ্য; তাই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণকরে ঐ গুলিকে সংগ্রহ করে রেখেছি, পাছে সহর অঞ্চলে রাখলে কৌতূহলী মনুষ্যের বৃথা অনুসন্ধিৎসায় আমার কাজের বিঘ্ন ঘটে, তাই ওগুলিকে সন্তর্পণে লোকলোচনের অন্তরালে এনে ভরণ-পোষণ করচি। ঐ জোড়া মানুষটা আমেরিকা থেকে এনেছি—এটা যমক সন্তান হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু ওদের জননীর দেহস্থ কুপিত বায়ু ওদের দ্বিধা বিভক্ত কর্ত্তে সমর্থ হয় নাই, তাই এই যুক্তমানব প্রসব করিয়াছে; ঐ মনুষ্যাকৃতি বনমানুষটা, ওর শরীরে মোটে লোম নাই—তুমি তো সব লক্ষ্য করে দেখ নাই, আমাদের এ কাজ শেষ হলে দুজনে আবার ঐ নিয়ে পড়ব—এটা ঠিক মানুষের মত, কেবল মুখটা মানুষের নয় সেটাতে সম্পূর্ণ বানরত্ব বিদ্যমান; এটাকে মধ্যআফ্রিকার জঙ্গলে দেখতেপেয়েসেখানকারলোকদের বিস্তর সোণা দিয়ে বশীভূত করে তবে ওটাকে ধরিয়ে এনেছি, এটাকে মানুষে পরিণত কর্ত্তে পাল্লে—পণ্ডিত ডারউইন যা কাগজে কলমে রেখে গেছেন বলে এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সহজে মানতে চায় না—তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হবে; তখন ঘাড় ধরে ডার উইনতত্ত্ব প্রমাণিত বলে স্বীকার করিয়া নেব—থাক্ আজ আর এ সব কাহিনী শুনাইয়া তোমাকে অন্যমনস্ক করে দেব না—তুমি যাও একবার

সালোয়াকে দেখে এস, আর এক বাটী গরম দুধ খেয়ে নাওগে—দেখ সালোয়া যেমন দুর্গাদাসের পৌত্রী, তার যেমন স্নেহের পাত্রী, আমারও সে তেমনি স্নেহপাত্রী—আমার জগতে কেউ নেই; আমার যা কিছু থাক্‌বে সব তাকেই দেব—তাই তোমাকে এত খুঁজে বার করেছি—তোমার হাতে তাকে দিলে যে কেবল আমার ধন ঐশ্বর্য্য সৎপাত্রে পড়বে তা নয়, তোমায় যদি এদিকে আকৃষ্ট কর্ত্তে পারি তবে ডাক্তার শঙ্কর লালের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার নূতন ধারাটী পৃথিবী থেকে লোপ না পেয়ে অনুশীলন ও আলোচনার মধ্যে জীবিত থাক্‌বে বলে এই চেষ্টা ও যত্ন—বুঝলে। আমিও সম্পর্কে তোমার দাদাশ্বশুর বলিয়া হই” স্নেহ-পরিহাস রসসিক্ত উচ্চহাস্যে ঘর ভরাইয়া দিলেন—আমি যেন কৃতার্থ হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম “আশীর্ব্বাদ করুণ আপনার এই অপূর্ব্ব ব্রত ধারণ করিবার যোগ্যতা যেন আমার থাকে।” “অপাত্রে শঙ্করলাল স্নেহ অর্পণ করে না শেখর, বলিয়া পরমস্নেহে আমার হাত ধরিয়া, ঘরের বাহিরে আনিলেন—বুঝিলাম এটা সালোয়াকে দেখিতে যাইবার জন্য পাঠান হইল! এই ছোট কাজটুকুর মধ্যে যে গভীর স্নেহভরা জিনিষ ছিল, তা সত্যই বর্ণনাতীত। আজীবন ব্রহ্মচারী, স্ত্রীবিমুখ, গৃহীরূপী সংসারী, এই প্রৌঢ়ের হৃদয়ে এই প্রেমে সহানুভূতি, এই অপরিসীম স্নেহ, কে গোপনে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল?—বোধ হয় প্রকৃতি। যে প্রকৃতি ইহার জীবনে কেবল কঠোর সংযমের তাড়নায় বিমুখ হইয়াছিল, সে অবসর পাইলেই স্নেহের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া বোধ হয় তৃপ্তি পাইত। আর যার উপর এই স্নেহ বর্ষিত হইত সে আমার মত মৃত সঞ্জীবনী পানে যে পরম পরিতৃপ্ত হইত তা বলা বাহুল্য।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সালোয়া তখন ও ঘরে শুইয়াছিল—আমি যাইতেই তাহার ডাগর ডাগর কালো চোখদুটী আমার মুখের দিকে ফিরাইয়া বলিল "দিব্যি না মান্‌লেই এই হয়, শঙ্করদাদা ওরকম কচ্ছিল কেন ডাক্তার বাবু?" আমি পরিহাস করিয়া বলিলাম "বোধ হয় দিব্যি দেওয়ার কথা জান্‌তে পেরেছিলেন" তারপর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলাতে সে যেন একটু সঙ্কুচিতা হইল—ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে বলিল "এর মূল এই হতভাগী—আমি অমন করে না উঠ্‌লে কিছুই হোত না" "না সালোয়া তা নয়—যা হবার তা হবেই, তুমি আমি কে? আমরা উপলক্ষ্য—আর এতে মানুষটীর ভেতর পর্য্যন্ত চিন্তে পারলুম—আর একটা বিশেষ লাভ হয়েছে—আমাদের বাঁধনটা কায়েমী হয়ে গেল" "যাও—তুমি বড় দুষ্টু" বলিয়া করস্পৃষ্টা লজ্জাবতী লতার মতন যুবতী লজ্জায় ও আনন্দে সঙ্কুচিতা হইয়া মুখ ফিরাইল—আমি তাহার ললাটে হস্তামর্ষণ করিতে করিতে বলিলাম "এখন তো দুষ্টু হবোই গো—কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজী, কালের ধর্ম্ম—কলি কাল কি না।" "হাঁগো সত্যযুগের দেবতা! আমিই মন্দ—তুমি তো খুব ভাল" "আচ্ছা দাদামশাই সেরে উঠুন না—তারপর তোমার ঝগড়া করা বার কোর্ব্বো এখন" "হ্যাঁ—দাদামশাই কেমন আছেন আজ" আমি সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা করিলে সে উচ্চ হাসিয়া বলিল "দূৎ! তা কি হয়, বুড়ো দাদামশাইকে তোমরা ছোকরা করে দেবে—তাহলে আমি কি করে দাদামশাই বলে ডাক্‌ব?" "দাদামশাই

বলতে যদি লজ্জা করে, না হয় বরমশাই বল” “ছিঃ তুমি বড় বেহায়া যখন তখন খালি ঐ সব ঠাট্টা,.তোমার একটু ও লজ্জা করে না।” “লজ্জা করবে স্ত্রীলোকের, পুরুষ মানুষের আবার লজ্জা কি? বিশেষতঃ ডাক্তারদের তো লজ্জা সরম থাকে না—যদিও প্রথম দুএকদিন একটু লজ্জা করেছিল—কিন্তু যেদিন থেকে হাতের উপর হাত পড়েছে—” “যাও, ফের ঐ কথা;—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না” “ঈস্ ভারি রাগ দেখ্‌ছি যে—ঐ কথা শোনবার জন্য আমায় কেবল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রাগাচ্ছেন আর আমি বলেছি বলে আবার রাগ হচ্ছে—” “দেখ তোমার সত্যি আক্কেল নেই, কখন আমি তোমায় ঐ সব কথা শুনবার জন্য খুঁচিয়েছি—কি মিথ্যাবাদী লোক তুমি—” আমি একটু গম্ভীর হইয়া কপট খেদের সহিত বলিলাম “আচ্ছা সালোয়া, আমি যদি অন্যায় করে থাকি আমায় মাপ কর, আমি আর তোমাকে জ্বালাতন কর্ত্তে আসব না” এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিবার ভাব দেখাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—সেও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া খপ্ করিয়া আমার বাঁহাত খানা নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল “অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল—একটু কি বলেছি তার ফলে অমনি অভিমান্—বেশ যাহোক” বলিয়া করুণ-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল—আমি যে উদ্দেশ্যে এই কপট অভিনয় করিতেছিলাম তাহা সিদ্ধ হইল—বেশ বুঝিলাম সালোয়া আমাকে সত্যই ভালবাসিয়াছে এতে চাঞ্চল্য নেই, মোহ নেই, কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি নাই। নারী হৃদয়ের অতলতলে যে শত সূর্য্যোকরজ্জ্বল অমূল্য মণি গুপ্ত থাকে আজ তাহার সন্ধান পাইলাম, এই মণির পরম পবিত্র আলোকে অন্ধকার হৃদয়ে সুখের চন্দ্র কিরণ নিপতিত হয়—ইহার স্পর্শে

দুঃখ দূর হয়—মানুষ ক্লেশ ভুলিয়া যায়, চিন্তা দেশ ছাড়িয়া যায়, সংসার পুণ্য হয়, ধন্য হয়। শৈশবে গল্পে পরশ পাথরের কথা শুনিয়াছিলাম তাহা স্পর্শে নাকি লৌহ স্বর্ণকান্তি ধরিত—বুঝিলাম কল্পনার স্পর্শমণি বাস্তবজগতে নারীর হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে, কেবল প্রেমের ইন্দ্রজাল মন্ত্রে সে মানবের হস্তগত হয়—যে এই অমূল্য মণির অধিকারী, জগতে তাহার অপ্রাপ্য কিছু থাকে না—তাহার দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার, কর্ম্মক্লান্ত দেহ—শোকতাপ জর্জ্জরিত মন—এই গুলির স্পর্শে সত্যই রূপান্তরিত হয়—বাঙালার প্রতি নারীহৃদয়ে এই মণি লুক্কায়িত আছে—যাহার আবশ্যক, যত্নকর এ রত্ন পাইবে। চৈতন্ দুধের বাটী হাতে করিয়া ডাক্ দিল—বাহিরে আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম—সে আপন মনে বলিতে লাগিল "এমন ভুল কিন্তু আমার কখন হয় না দাদাবাবু, আজ সেই পিচেশ ব্যাটাকে দেখে অবধি আমার মগজটা যেন কেমন হয়ে গেছে—কি কাণ্ডই কল্লুম! আমার গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে, গয়লা তো গয়লা—একটু বুদ্ধি নেই—সাধে বলে দাদাবাবু গয়লার বুদ্ধি হয় আশীবচ্ছরে" আমি তাহাকে প্রবোধ দিব, কি তাহার স্বগতোক্তি শুনিয়া হাসিব, ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না—শেষে অনেক কষ্টে তাহাকে প্রবোধ দিয়া ডাক্তার বাবুর উদ্দেশ্যে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম রোগীর নাড়ী ধরিয়া স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে বসিয়াছেন—একাগ্রতা যেন তাহার মুখের ভাবে, চোখের চাহনীতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—সে মূর্ত্তি দেখিলে হঠাৎ মনে হইত এ বুঝি ভাস্কর খোদিত পাষাণ মূর্ত্তি। আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন "এই যে এসেছ—কোন রকম অসুস্থতা নাই তো—যদি থাকে, আজ না হয়

একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্প লাফাইয়া তাহার পায়ের
উপর পড়িল।

তুমি বিশ্রাম কর, আমি এখানে থাকিব” আমি বিনীত ভাবে বলিলাম “না—আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ—আপনি বরং আজ অন্য কাজে হাত না দিয়া বিশ্রাম করুন।” উত্তরে তিনি মৃদু হাসিলেন—বলিলেন “আজ তোমাকে আমার আর একটী বন্ধুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিব” বলিয়া কোণ হইতে সেই ঝাঁপিটা তুলিয়া ডালা খুলিয়া দিলেন—আর তড়াক্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্প লাফাইয়া তাঁহার গায়ের উপর পড়িল—আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া চার পাঁচ পা পিছাইয়া গেলাম—ওঃ কি ভয়ানক—জীবন্ত কৃষ্ণসর্পকে যে এমন ভাবে গায়ের উপর ধরিতে পারে সে হয় দেবতা না হয় দানব। আমার বিস্ময় ও ভয় দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন “এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই চার বৎসর আগে এটীকে এই সুন্দরবনের কালীমন্দিরে পেয়েছি—সে অবধি এটী আমার পরম বন্ধু, কেহ আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, আমি তাহাকে ক্ষমা করিলেও বন্ধু তাহাকে ক্ষমা করিবে না—অথচ এতবড় একটা বন্ধুকে রাখিবার কোন খরচ নাই খোরাকী বাবদ এক পয়সাও খরচ হয না। কি মজা!” বলিয়া ছেলে-মানুষরা খেলা কর্ত্তে কর্ত্তে যেমন হেসে উঠে সেই রকম করে হেসে উঠ্‌লেন। আমি বলিলাম “এসকল জন্তু নিয়ে নাড়াচাড়া কর্ত্তে আপনাব ভয় হয় না—না ওর বিষ দাঁত ভেঙে দিয়েছেন।” “বিষ দাঁতই যদি ভাঙলুম তো ওর পেলুম কি—সে ত হয়ে গেল খেলা ঘরের সাপ—আমি কি একটা সাধারণ সাপুড়ের মত লোকের কাছে ভড়ং দেখাবার জন্য একে পুষেছি মনে কর, দেখবে এই দেখ্ বলিয়া সাপের মাথায় অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলেন, আঘাত পাইয়া সর্প প্রকাণ্ড ফণা

তুলিয়া ফোঁস্ ফোঁস করিয়া দুলিতে লাগিল—আর তাহার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী হইতে যেন কালানলে শিখা বহির্গত হইতে লাগিল—সে সময় সেই সর্প বেষ্টিত শঙ্করলালকে দেখিলে মনে হইল, কৈলাসের শঙ্কর বুঝি মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। "রাগ কর্চ্ছ বন্ধু" বলিয়া যেমন তাহার সেই উদ্যত ফণার উপর ধীরে ধীরে হস্তামর্ষণ করিলেন, অমনি সেই সূর্পাকৃতি ফণ সঙ্কুচিত হইল, সাপটী যেন আদর বুঝিতে পারিয়া সানন্দে তাহার গলায় লেজ জড়াইয়া তাঁহার মাথার উপর মাথাটী রাখিয়া শুইয়া আমার দিকে পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতেলাগিল। যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় আমাকে অভিভূত করিল। শঙ্করলাল সেই অবস্থায় টেবিলের উপর বসিয়া বলিলেন "এই হিংস্র জীবদের বশ করা বড় শক্ত, কিন্তু এদের ভেতর একটা অনুভব শক্তি আছে সেটা প্রায়শঃ সুপ্ত থাকে; সেটাকে জাগিয়ে যদি নিজের অনুভূতির সঙ্গে তার আদান প্রদান করে বশ করা যায়, তাহলে আর তার কাছে আশঙ্কা থাকে না—নইলে ভয় দেখিয়ে এদের বশীভূত করা যায় না;—আবার জোর করে বিষ দাঁত ভেঙে দিলে এদের নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা থাকে না। জীব জগতের সঙ্গে মানুষ যেদিন এই অনুভূতির আদান প্রদানে সমর্থ হবে, সেদিন বিজ্ঞান রাজ্যে একটা ভয়ানক হুলস্থূল পড়ে যাবে—অনেক অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে, তখন জন্তুদের ভাষাও আমরা বুঝতে পারব, তারাও আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে; এই যে দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীবজগৎ, এদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলবে, বিজ্ঞানের জয়-ধ্বজা প্রকৃতির উপর অচলভাবে প্রতিষ্ঠা হবে—'এই কথায় যে কি আবেগ, কি উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা আমি হৃদয়ে

অনুভব করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছিলাম; আর ভাবিতেছিলাম কি অসামান্য শক্তিধর এই মহাপুরুষ যাঁহার ইঙ্গিতে নিদারুণ বিষধরও ভৃত্যবৎ আজ্ঞা পালন করে! কে এ যক্ষ রক্ষ—গন্ধর্ব্ব—কিন্নর—পিশাচ না দেবতা?

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার শঙ্করলাল সবান্ধবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে আমি দরজায় খিল দিয়া—প্রদীপটা একটু উস্কাইয়া দিয়া চেয়ারটী রোগীর শয্যার কাছে টানিয়া লইয়া বসিলাম। এক একবার সমস্ত যন্ত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া টেম্পারেচার লইলাম; জয় জগদীশ! এ কি টেম্পারেচার যে আবার পূর্ব্বভাব আসিয়াছে, আমার দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল—তাড়াতাড়ি চার্টে সময়টা লিখিয়া রাখিলাম, রোগী কিন্তু পূর্ব্ববৎ অচল অটল—তবে একটু উন্নতি বুঝিলাম যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহজ লক্ষণগুলি যেন সুস্পষ্ট হইয়াছিল; পূর্ব্বকারে মত সেই টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস লওয়াটা ছিল না; তার পর খানিকক্ষণ সেই ঝাঁপিটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যেন কোন ভদ্রজীবের বাসস্থান; কিন্তু যখন ইহার বাসকারীর সেই ক্রুদ্ধমূর্ত্তি মনে পড়িয়া গেল, তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে তাহাকে টেবিলের উপরে রাখিয়া আবার নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিলাম। বসিয়া বসিয়া কত কি যে মাথামুণ্ড ভাবিতেছিলাম তাহা আর মনে নাই—ক্রমশঃ পুরী নীরব হইল—এতক্ষণ মধ্যে মধ্যে পাকশালার দিক হইতে মিশির

জীর অর্দ্ধ হিন্দী অর্দ্ধ বাংলা বুলি ও চৈতন্ত গৃহিনীর ঝঙ্কারময়ী ধ্বনি মাঝে মাঝে পাইতেছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তাহাও নীরব; চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার—গৃহমধ্যে স্তিমিত দীপালোক আর শয্যায় সেই অদ্ভুত রোগী? বসিয়া বসিয়া ঘুম ধরিতেছিল—ঘুমটী বেশ ঝিমকিনি দিয়া আসিতেছিল। এক একবার উঠিয়া চোখ মুছিয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করি; আবার সে আসিয়া জবরদস্তী চোখদুটাকে চাপিয়া ধরে, আবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পায়চারী করিতে থাকি; এমনি করিয়া ঘুমে মানুষে প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—ক্রমশঃ রক্তমাংসের দৌর্ব্বল্যবশতঃই হউক আর যাই হোক, পাঁচ সাত মিনিট ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—হঠাৎ একটা ঝন্ ঝন্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখি রোগীর তক্তা-পোষের পাড়নে একখানা প্রকাণ্ড ভোজালী বিঁধিয়া রহিয়াছে, আর তাহার কাঠের বাঁট্‌টা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মেঝেময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—পশ্চিম দিকের জানালা খোলা ছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখি সেই ঘন নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী তীব্র চক্ষু আমার দিকে একটা বিকট বীভৎস্য পৈশাচিক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, যেন জলন্ত অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে, সে চাহনী দেখিয়া বুঝিলাম এ সেই কাণা চীনাম্যান সন্‌কিউ। বিদ্যুৎবেগে টেবিলের উপর হইতে রিভলভার তুলিয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিলাম—ধড়াম্ করিয়া ভীষণ আওয়াজ হইল, ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল—আর একটা দানবীয় অট্ট হাসির খল খল শব্দে যেন বাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল, আমি যাঁহাতে দেয়াল ধরে কোণের কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম—"কি হয়েছে শেখরলাল, ওকি অমন কচ্ছ কেন "বলিয়া ডাক্তার শঙ্করলাল ইলেকট্রিকটর্চ জ্বালিয়া

জানালায় দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম, শীঘ্র খুঁজুন—সন্‌ফিউ এসেছিল” বলিয়া আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলাম—ডাক্তার পকেট হইতে বৈদ্যুতিক আলোক বাহির করিয়া বোতাম টিপিয়া জ্বালাইলে গাঢ় তমোরাশি ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ আলোক রশ্মি অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল—কিন্তু কোথাও সেই দানবরূপী মনুষ্যের চিহ্নও পাওয়া গেল না—ডাক্তার শয্যার প্রান্তে বিদ্ধ ভোজালীখানা খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন—একখানা সুবৃহৎ নেপালী ভোজালী, সেটা যে অমিতশক্তি প্রয়োগে বাতায়নপথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ডাক্তার বলিলেন “বড় কপাল জোর আজ সব রক্ষা হইল—এই ভোজালী তোমার কিম্বা রোগীর গায়ে লাগিলে কি যে হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু এমন ভাবে কয়দিন চলিতে পারে এক একটা হেস্ত নেস্ত না করিলেই নয়, সমস্ত বন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধরিতেই হইবে—নতুবা এমন শিয়রে শমন লইয়া নিশ্চিন্তে কার্য্য করিতে পারিব না।” আমার ভয় অনেক কাটিয়াগিয়াছিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিতেছিলাম।

ডাক্তার রোগীর কাছে বসিলেন—তাঁহার প্রিয় বন্ধুটী পরমানন্দে ঘরের মেঝেয় বিচরণ করিতে লাগিল—আমি অতি সন্তর্পনে ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচের কক্ষে আসিলাম, একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিলাম।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘটনাটা ক্রমেই বেশ পাকাইয়া উঠিতেছিল—এবং এর মধ্যে যেন একটা ভীষণতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু আমার আর ভয় ডর ছিল না—মেডিক্যাল কলেজে যখন প্রথম ঢুকি তখন যেমন হাড়গোড় ঘাঁটতে, মড়া ছুঁতে—ভয় কর্ত্তো, ঘৃণা কর্ত্তো—তারপর আবার যেমন অভ্যস্ত হইয়া তাহাতেই আনন্দ পাইতাম, এও সেই রকম "রপ্ত" হয়ে পড়েছিল—তাই এই বিভীষিকাময় বিপদসঙ্কুল কাজেও বেশ আনন্দ পাইতাম।

পরদিন প্রাতে যখন আসিলাম, তখনও ডাক্তার সজাগ—সতর্ক ভাবে বসিয়া; আমি আসিতেই বলিলেন আর তিনদিনেই তোমার রোগী চলে হেঁটে বেড়াবে—আজকে ক্ষুর দিয়ে ওর মাথা বেশ করে কামিয়ে দাও—চুলগুলাকে শাদা রেখে আর বার্দ্ধক্যের স্মৃতি-চিহ্ন রাখি কেন? কি বল—বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন—আমি ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিতে বসিলাম ভাবিলাম এখনকার দিন হলে বোধ হয় আর এত কাজ কর্ত্তে হ'ত না একশিশি বাঁড়ুর্য্যের নিরুপমা তেল মাখাইলে কাজ অনেকটা এগিয়ে আস্‌ত—মস্তক মুণ্ডন করিতে করিতে বলিলাম—"আপনার বন্ধুটীকে যে দেখ্‌ছি না"? "তাকে ছেড়ে দিয়েছি—সে এই বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সেই চীনাম্যানের সন্ধান করিয়া আসিবে—যেখানেই থাক না কেন সে ঠিক আসিয়া আমাকে তথায় লইয়া যাইবে—সাপের এই অনুসরণ-শক্তি অতি অদ্ভুত; ঘ্রাণ-

শক্তিশালী শিক্ষিত কুকুর যেখানে পরাস্ত, সেখানেও এর ক্ষমতা অলৌকিক—জলে স্থলে বৃক্ষে কোথাও লুকাইয়া থাকিলে ইহার কাছে অব্যাহতি নাই—এই শক্তি প্রয়োগ যখন খুব উন্নত অবস্থায় আসিবে তখন গোয়েন্দা বিভাগের কাজ খুব হাল্কা হয়ে পড়বে—বড় বড় খুনে ডাকাত এরা খুঁজে বার করে দিবে—" এখন এসব কথা শুনলে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বোধ হয়—কিন্তু ডাক্তার শঙ্করলালের অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া তখন আমার সে কথায় মোটেই অবিশ্বাস হয় নাই। ডাক্তার উঠিয়া আবার সেই বড় কাল সিন্দুকটী খুলিলেন ও আর একটী চীনা-মাটির পাত্র বাহির করিলেন। এ পাত্রটীও বহু শতাব্দীর পুরাতন বলিয়া অনুমান হইল এবং তাহার বহির্ভাগে বিচিত্র ভাষায় কত কি লিখিত রহিয়াছে দেখিলাম। ভাষা হয় চীন দেশীয় না হয় তিব্বত দেশীয়; সেই পাত্র হইতে খানিকটা কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় তৈলাক্ত স্নেহময় পদার্থ বাহির করিলেন তাহাতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রোগীর মাথাটী বেশ করিয়া মুড়িয়া কচি কলাপাতা চাপা দিয়া বেশ করিয়া বন্ধন করিয়া দিলেন। ডাক্তার বলিলেন এই তেলটী বহুকষ্টে সংগৃহীত—তিব্বতের মানস সরোবরের উপর এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়, ইহা সেই পক্ষীর তৈল—একজন বুড়ো তিব্বতীর কাছ থেকে অনেক স্বর্ণ-মুদ্রা দানে ইহা সংগ্রহ করিয়াছি—পক্ষ কাল ব্যবহারে এই তৈলের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিবে—এই বৃদ্ধের মস্তকে যুবজনোচিত সুকৃষ্ণ কেশ-কলাপের উদ্ভব হইবে। আবার শুনিয়াছি যে ঐ পক্ষীর সরক্ত কাঁচা মাংস খাইলে অতি দুরারোগ্য ভীষণ গলিতকুষ্ঠ, পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়—এসব দ্রব্যগুণের কতটুকু জ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

আমাদের দিতে পারে শেখর ?" আজকাল নিরুপমা তেলেও অনেকটা এই রকম কাজকরে তাই ভাবি তারা কি সেই বুড়ো তিব্বতীর রহস্য টের পেয়েছে নাকি ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ খাওয়াইবার ঔষধ কিছু আছে কি ?" তিনি বলিলেন হাঁ—তবে এখন নয়, ১২টার পর। এখন Hypodermic syringe করে একটু রক্ত একটা Test Tubeএ করে দাও Analysis করে দেখি, তারপর ঔষধটা দেওয়া হবে কিনা বলবো—"আমি তৎক্ষাণাৎ রক্ত মোক্ষণ করিলাম—দেখিলাম উজ্জল লাল রংএর রক্ত, সুস্থ যুবকের শরীরের রক্তের মতই বোধ হইল—তিনি সেই Test Tube লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন—প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে অন্য একটী ক্ষুদ্র শিশিতে রক্তবর্ণের কয়েক ফোঁটা ঔষধ আনিয়া বলিলেন—ইহার ৩ ফোঁটা খাওয়াইয়া দিবে—দিলে বোধ হয় রোগী একটু নড়াচড়া করিবে—ভয় পাইবে না—কেবল সব রকম Temperature যেন ঠিক থাকে, আর ব্যাটারীর পাওয়ার আজ থেকে পাঁচ পয়েণ্ট কমে করে দেবে।" আমি তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিলাম—তিনি নীরবে দাঁড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, কার্য্য-সাফল্যের একটী আনন্দ হিল্লোল তাঁহার চক্ষে প্রবাহিত হইতে-ছিল, দেখিয়া আমিও যেন তৃপ্ত হইলাম। আশ্চর্য্য! ঔষধ সেবনের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগী যেন হাই তুলিবার মত হাত তুলিতে লাগিল এবং অল্প অল্প পা নাড়িতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ পাশ ফিরিয়া শুইল—" "ডাকলে ডাক্ শোনে—এমন ঔষধের গল্প শুনে থাকবে হয় তো শেখর, এসব ঔষধ সেই শ্রেণীর ; অথচ অতি সামান্য এই বনজাত লতাগুল্ম হইতে প্রস্তুত—যে দেশের লোক, তাকে সেই দেশের ঔষধ

দিলে যেমন ফল হয় বিদেশী ঔষধ দিলে তেমন ফল হয় না—আমাদের পুরাতন চিকিৎসা প্রণালী অধ্যয়ন ক'রে তার সঙ্গে যদি প্রতীচ্য বিজ্ঞানের যন্ত্রাদি ও নূতন নূতন উদ্ভাবিত উপায় গুলির সম্মিলন করে উন্নত ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালী কখনও প্রবর্ত্তিত হয়, তা হলে দেখো মৃত্যু সংখ্যা কত অল্প হয়ে যাবে—কত সুলভে, সহজে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন হবে, অথচ দেশও সমৃদ্ধ হইবে এবং দেশের চিকিৎসকদেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে—কিন্তু তাকি হবে শেখর ?" "কেন হবে না— আপনার দ্বারাই তার সূত্রপাত হবে এবং আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার যতটুকু শক্তি সমস্ত নিয়োজিত কর্ব্ব—" চিন্তামগ্ন ভাবে অন্যমনস্কে তিনি যেন বলিয়া যাইতে লাগিলেন "পার্ব্বে—পার্ব্বে—যদি এ কাজ কারুর দ্বারা সম্ভব হয় তো সে তুমি—কলিকাতায় যখন তুমি পড়, তখন কলেজের মধ্যে ধীশক্তি সম্পন্ন একটী যুবককে অন্বেষণ করিতে গিয়া তোমার সন্ধান পাই—সেই অবধি তোমার গতিবিধির উপর আমার লক্ষ্য ছিল—কিন্তু যখন অভাবে পড়িয়া তুমি কলেজ ছাড়িলে— একবার ভাবিলাম আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমার পাঠ সমাপনে অর্থ সাহায্য করি, আবার ভাবিলাম না, তাহা হইলে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হইবে, আর তা ছাড়া আমার কাজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশংসা পত্রেরও দরকার ছিল না—তারপর যখন তুমি কলেজ ছাড়িয়া ষ্টীমারে চাকরী নিলে, তখনও তোমায় আনাইয়া নিজের কাজে নিযুক্ত করিতাম কিন্তু তখনও ভাবিলাম যাক্ আরও কিছুদিন ; চাকরী করিয়া চাকরীর দায়ীত্বজ্ঞান লাভ হইলে তোমায় আনিব—কিন্তু পথিমধ্যে যখন তোমার বসন্ত রোগ হইল, যখন সংক্রামক রোগ বলিয়া

জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ তোমার জীবনাশায় নিরাশ হইয়া তোমায় সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ করিল টের পাইলাম—তখন আত্ম প্রকাশ করিয়া তোমার চিকিৎসা ভার গ্রহণ করি ও তোমায় আরোগ্যোন্মুখ করিবার রেঙ্গুন হাঁসপাতালে তোমায় রাখিয়া যাই—ভাগ্যে তোমার জাহাজের কাপ্তেন বার্ণাড ও হাঁসপাতালের বড় সাহেব আমার পরিচিত ছিলেন; নতুবা তোমায় রক্ষা করা সুকঠিন হইত—এসব কথা এতদিন তোমায় জানাই নাই—আজ তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত, পুত্রাধিক প্রিয়, তাই এসব গুপ্তকথা প্রকাশ করিলাম—শেখর, যত্ন না করিলে রত্ন মিলে না—কত পরিশ্রমে কি প্রাণপাতে যে আমি নিজের কার্য্যের উপকরণ ও সাহায্যকারী জীব ও মনুষ্য সংগ্রহ করি তাহা তোমায় কি জানাইব—সে সব কাহিনী আরব্যউপন্যাসের গল্পের চেয়ে অদ্ভুত—স্বপ্নের চেয়েও অবিশ্বাস্য। আমার সঙ্গে যে ঘনিষ্ট সম্পর্কে সংলিপ্ত সে ভিন্ন অন্য কেহ সহসা এ সব কথা শুনিলে বিশ্বাস করিবে না।"

এ সব কাহিনী শুনিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া বলিলাম—"যে প্রাণ এত দয়া করিয়া রক্ষা করিয়াছেন—আশীর্ব্বাদ করুণ—আপনার ব্রতের পূর্ণ কামনায় যেন তাহা উৎসর্গ করিতে পারি।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হঠাৎ একটা হিস্ হিস্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—কিছুপরেই শঙ্কর-লালের সেই অদ্ভুত বন্ধুরূপী কৃষ্ণসর্পের আগমন হইল—তিনি সযত্নে সেটীকে তুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন—সে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইল—তাহার দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন "পেয়েছ সন্ধান—উত্তরে সে একবার মাত্র জিহ্বা বাহির করিল—তাহার চোখ দুটী মিট্ মিট্ করিতে লাগিল, সে চোখ দুটীর চাহনীতে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহা সহজেই অন্যকে অভিভূত করিতে পারিত—শঙ্করলাল তাহার চোখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ও ৪।৫ বার অঙ্গুলি দ্বারা কয়েক প্রকার ইঙ্গিত করিলেন, ইহা ব্যতীত মানব ও জীবের এই অদ্ভুত কথোপকথনের কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না—তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ওহে শেখর—অনেকটা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে এই বনমধ্যেই এখনও আছে এবং ঐ ভগ্ন মন্দিরই তাহার বর্ত্তমান বাসস্থান—যাক্ আহারাদির পর তার অন্বেষণে একবার যেতে হবে—সে এখানে থাক্‌তে আমি আর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পার্চ্ছিনা—একটা দুঃস্বপ্নের বোঝার মত সে যেন অহরহ আমার বুকে বসিয়া আছে।" "এখন আর ঔষধাদি কিছু দিবার আছে কি?" "কিছু না, রোগীকে আজ আর দেখিতে হইবে না—তুমি বরং সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া একটু বিশ্রাম কর—আজ আর তোমার উপস্থিত থাকা আবশ্যক হইবে না" আমি বলিলাম "তাহলে চলুন আমিও

আপনার সঙ্গে যাইব” “কেন বৃথা আমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে—আমি আর আমার বন্ধু দুজনেই তাকে খুঁজে বার কর্ব্বো” বলিয়া টেবিলস্থিত সেই কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণসর্পের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন “কি বল বন্ধু পার্ব্বো না?” বন্ধু প্রত্যুত্তরে জিহ্বাগ্রভাগ প্রদর্শন করিলেন—বলিলেন “ওহে বন্ধু বলেছে পার্ব্বো—বলিয়া তিনি সযত্নে তাহাকে ঝাঁপির ভিতর পুরিয়া ঝাঁপিটী বগলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সেই সবল মুখমণ্ডলে যেন একটা দুর্ব্বলতার ছায়া পড়িয়াছে দেখিলাম—আর দুর্দ্দান্ত সনফিউএর বিষম প্রতি বিধিৎসার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—তাহার সম্মুখে এই অবস্থায় ইহাঁকে কিছুতেই একাকী দেওয়া যাইতে পারে না, এই কথাটা যেন আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল - আমি বলিলাম “না ডাক্তারবাবু—আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে—তার কাছে একা আপনার যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না” “ভয় পাচ্ছ শেখর—আমার শক্তি তুমি জান না—তাকে যেমন দুর্দ্ধর্ষ দেখেছ, আমিও তার চেয়ে কম নেই জেনো—আমি শক্তিসাধক, মা কপালিনীর আশীর্ব্বাদে আমার কিছু অনিষ্ট হইবে না—যাই হোক্ তোমার যখন এত যাইবার ইচ্ছা, তখন তোমায় বাধা দেব না—ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দরজায় তালা দাও, চাবিটা নিজের পকেটে রাখবে—খাওয়া-দাওয়া সেরে এক ঘণ্টার মধ্যে—আমার ঘরে এসো, দুজনে বাহির হইব” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমিও ঘরের তালা বন্ধ করিয়া আহার্য্যান্বেষণে গমন করিলাম। রান্নাঘরের কাছ বরাবর গিয়ে দেখি, মিশিরজীর সঙ্গে চৈতন্য গৃহিণীর তুমুল কলহ চলিতেছে;

আর মধ্যস্থারূপিণী সালোয়া মিষ্ট হাস্তে সেই দ্বন্দ্ব সমাধান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিল "এসো! এসো! ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি— কিছুতেই আর ঝগড়া মিট্‌তে পারছি না" আমি সহাস্তে বলিলাম "ব্যাপার কি?" "ব্যাপার গুরুতর" বলিয়া সবিস্তারে ঘটনাটা আমায় বলিল। ঘটনাটা এই—গত রাত্রের রিভলবারের আওয়াজে ঠাকুর অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল—এবং সে একটা ভূতকে এই ঘরের মধ্যে স্বচক্ষে বেড়াইতে দেখিয়াছে, সকালে পাক করিতে করিতে সে কথা চৈতন্য গৃহিণীকে বলায়, সে ভূতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, ঠাকুর তাহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে যে সে উচ্চ ব্রাহ্মণ হইয়া কি মিথ্যা বলিতেছে— তাহার উত্তরে চৈতন্য গৃহিণী বলচে "যে সে বামুন না ছাই; একটা ম্যাড়া না জানে রাঁধতে না জানে কিছু—আর বামুনের আবার ভূতের ভয় কি?" ব্রাহ্মণত্বে আঘাত লাগায় মিশিরজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সালোয়াকে মধ্যস্থ মানিয়া বলে যে সে এমন নোক্‌রী কর্ব্বে না—তাহাকে কি না বলে বামুন না ছাই, সে কি একটা যে সে বামুন, সমস্ত তুলসীদাসী রামায়ণ তার পড়া, এরকম অপমান সে কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না, চৈতন্য-গৃহিণী ও সহজ নীচু হইবার স্ত্রীলোক নহে সে বলে ও যদি বামুন তো ওর অত ভূতের ভয় কেন? একবার রামনাম কল্লে ভূত দেশ ছেড়ে যায়, যার রামায়ণ কণ্ঠস্থ তার সামনে ভূত আসে কি করে।" আমি দেখিলাম উভয় সঙ্কট—দুজনকেই সন্তুষ্ট করিতে হইবে—সেই জন্য চৈতন্য পত্নীকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া মিষ্টকথায় বলিলাম "দেখ চৈতন্তকে আমি দাদা বলি, সে হিসাবে তুমি আমার বৌদিদি; বুঝ্‌লে— সেইজন্ত আমার খাতিরে অন্ততঃ ওকে একটু খুসী করে দাও—আর দেখ্‌

হাজার হোক্ ও বামনের ছেলে তো, যদিও সন্ধ্যাহ্নিক করে না তবু ওকে দুটো মিষ্ট কথা বলে খুসী করে দাও? আমার মিষ্ট কথায় চৈতন্য গৃহিণীর মনটা একটু নরম হইল—কলকাতার এত বড় একটা ডাক্তারের বৌদিদি হওয়াটা বোধ হয় সে গৌরবের কথা মনে করিয়াই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আবার ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলাম "মিশিরজী তুমি যে খুব বড় ব্রাহ্মণ তাকি আর আমরা জানি না—তোমরা হচ্ছো মিথিলা দেশের বামুন, যেখানে সীতামায়ীর বাপের বাড়ী—সেই দেশের লোক; তবে কি জান ও মূর্খ স্ত্রীলোক, জাতে গোয়ালা; ওর কথা শুনে রাগ করলেই বা চলবে কেন, ভূত অবশ্যই এসেছিল তবে যদি তুমি রাম নাম কর্ত্তে তো ভয় থাকৃতো না।" উত্তরে মিশ্রসুত বলিল "ভয় হামি কোরে না বাবু—হামকেয়া ভূতকো ডরতা হায়—আপ্-সমজদার আদমী হায় আপ্ মানা কর দিয়া, নেহি তো উস্কো হাম আজ দেখ-লেতে" বলিয়া চোক পাকাইয়া নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের ভস্মকরীবিদ্যার শেষ চিহ্ন স্বরূপ কটু মটু করিয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়া পাক-শালায় প্রবেশ করিলেন। আপোষে মামলা মিটিল দেখিয়া আমিও সালোয়া দালানে যাইলাম। সালোয়া হাসিয়া বলিল "তা হলে বাহাদুর বলতে হবে" "নিশ্চয়—এখন মামলা তো মিটিল—উকীল ফীর কি হবে?" হাসিয়া ঘর হইতে তেলের বাটী আনিয়া দিয়া বলিল "এ তো ডিস্‌মিসের মামলা এর ফী হচ্ছে একথালা ভাত, যাও নেয়ে এস।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিদ্যুতের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, আমিও তৈল মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলাম।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে যখন ডাক্তারের কক্ষে যাইলাম তখন তিনি আহারে বসিয়াছেন, এই অদ্ভুত কর্ম্মীর আহার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কলার পাতে সামান্য অন্নমাত্র ভোজন করিতেছেন দেখিলাম, বুঝিলাম ইনি হবিষ্যাশী। সমস্ত দিনরাতে একবারমাত্র এই এক মুঠা হবিষ্যান্ন ভোজনে কি করিয়া যে এত আধ্যাত্মিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময়ে চকিত হইলাম। আর ভেতো বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই ভাতই যে এত শক্তি জন্মাইতে পারে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ভোজনকালীন তিনি রুদ্ধবাক্ থাকেন, সুতরাং আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি দ্বারদেশে বসিয়া সেই ক্ষুদ্র কক্ষটী দেখিতে লাগিলাম—বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যন্ত্রাদিতে ঘরটী পূর্ণ; হঠাৎ দেখিলে একটী উচ্চাঙ্গের ল্যাবরেটরী বলিয়া বোধ হইবে—একপার্শ্বে একখানি প্রকাণ্ড লোমশ চর্ম্ম বিস্তৃত, বুঝিলাম এই তাঁহার শয্যা; চর্ম্মখণ্ড কোন পার্ব্বত্য জীবের বলিয়া বোধ হইল কারণ অত বড় বড় সাদা লোমে আবৃত কোন জীবই বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না পরে শুনিয়াছিলাম ইহা তিব্বতীয় ছাগ চর্ম্ম—বাস্তবিক এত বড় আকৃতির ছাগ যে কোন দেশে থাকিতে পারে তাহা না প্রত্যক্ষ করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম সেটা তাঁহার সংগৃহীত পুঁথি—কত জীর্ণ শীর্ণ গলিত পুঁথি আনিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন—কত দেশদেশান্তর হইতে যে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে লোকটার অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আহারান্তে উঠিয়া একখণ্ড হরিতকী মুখে দিয়া বলিলেন "শেখর—যে পুঁথির জন্য আজ আমাকে প্রতি মূহর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত থাকিতে হইতেছে তাহা এই দেখ" বলিয়া গৃহকোণস্থ একটী সুদৃঢ় সুবৃহৎ লৌহ সিন্ধুক উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণ রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত জরাজীর্ণ পুঁথি বাহির করিলেন। পুঁথিখানি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত, স্থানে স্থানে গলিত ও অস্পষ্ট হইয়াগিয়াছে; অতি যত্নে তিনি সেখানি আমার সামনে ধরিলেন—তাহা যে কি ভাষায় লিখিত তাহা আমার বোধগম্য ছিল না—তবে তাহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিলাম—তিনি বলিলেন দ্বিসহস্র বর্ষের পুরাতন পুঁথী, এত পুরাতন পুঁথী এখন আর জগতে আছে কি না সন্দেহ—কেহ যদি ইহার সহিত হীরক ওজন করিয়া দেয় তবুও তিনি তাহা হস্তান্তরিত করিতে পারেন না—এবং ইহারই জন্য তিব্বতে তিনি মরিতে মরিতে কেবল দৈববলে বাঁচিয়া গিয়াছেন—এবং ইহারই পুনরুদ্ধারকল্পে সন্‌ফিউ গত চারি বৎসর মৃত্যুছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তৎপরে পুঁথী যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া সিন্ধুক বন্ধ করিয়া আমায় বলিলেন চাবিটা দাও আমি বন্ধুকে লইয়া আসি, তুমি ততক্ষণ রিভলভার দুটা ঠিক করিয়া লও ও দুগাছা বড় লাঠী লইয়া আইস।"

চৈতন্যকে সতর্কতার সহিত গৃহের প্রহরায় নিযুক্ত করিয়া আমরা উভয়ে সেই ভগ্নপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাটীর বাহিরে আসিয়াই ডাক্তার ঝাঁপি হইতে বন্ধুবরকে মুক্ত করিয়া দিলেন—সে অগ্রে অগ্রে আমাদের পথপ্রদর্শন করিয়া চলিল—আশ্চর্য্য দেখিলাম যে বনের সেই

ক্ষীণপথ রেখা ধরিয়া সে ধীরে অতিধীরে চলিতে লাগিল আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম—কোথাও পথভ্রষ্ট হইয়া বনে জঙ্গলে চলিয়া গেল না—ক্রমে দেখিলাম সে ভগ্ন মন্দিরের পথ অবলম্বন করিল—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলাম—ক্রমশঃ সর্প মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল—তাহার পর বিগ্রহের পশ্চাৎস্থ স্তূপী-কৃত প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—আমরা হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম—আমি মনে করিলাম—এইবার সর্প পলায়ন করিয়াছে—এবং ভাবিলাম একটা বন্য সর্পের ভরসায় এরূপ অন্বেষণ করিতে আসা কত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে—ডাক্তার দমিবার পাত্র নহেন—বিফলতা কাহাকে বলে তাঁহার অভিধানে তাহা লেখা ছিল না। তিনি বলিলেন "সাপ পালিয়েছে মনে করেছ শেখর! কখন নয়—সে পালাতে পারে না—তার পালাবার ক্ষমতা নেই—" বলিয়া পকেট হইতে একটী ছোট বাঁশের বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল—এরূপ অদ্ভুত করুণ স্বর আমি কখন শুনিনাই; হঠাৎ শুনিলে মনে হয় যেন কেহ কাঁদিতেছে—৪।৫ মিনিট বংশীধ্বনি হইবার পর খড় খড় করিয়া আওয়াজ হইতে লাগিল এবং সেই স্তূপীকৃত প্রস্তর ভেদ করিয়া বন্ধুবরের পুনরাবির্ভাব হইল। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বংশীধ্বনি বন্ধ করিলেন সে অবলীলাক্রমে তাঁহার হাতে জড়াইয়া ধরিল। ডাক্তার বলিলেন—"শেখর! ব্যাপারটা খুব সোজা নয়, সন্‌ফিউ এই মন্দিরে লুক্কায়িত আছে—পাথরগুলা সরাইয়া দেখিতে হইবে—তখন দুজনে এক এক করিয়া সেই স্তূপীকৃত প্রস্তর সরাইয়া ফেলিলাম। দেখিলাম বিগ্রহপার্শ্বস্থ মেঝেয় একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত রহিয়াছে—

তাহার মধ্যেই যে সর্প প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তাহলেই বা কি হয়, সন্‌ফিউ তো সেই গর্ত্তের মধ্যে থাকিতে পারে না, ডাক্তার চিন্তিত হইলেন—স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল—তিনি হাতের লাঠী সেই মেঝেয় ঠুকিতে লাগিলেন হঠাৎ একটা জায়গার আওয়াজ কেমন ফাঁপা বোধ হইল—তিনি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন! "শেখর হয়েছে বন্ধু আমায় ঠকায় নি—এই মন্দিরের তলাটা ফাঁপা, বোধহয় কোনরূপ গুপ্ত কক্ষ টক্ষ আছে এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার রাস্তাও আছে—এবং সেই কক্ষেই সন্‌ফিউ বাস করে।" যাহা হউক কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও যখন রাস্তার কোন কিনারা করিতে পারিলাম না তখন উভয়েই বড়ই চিন্তিত হইলাম মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগের দেয়ালের কাছটাতেই সেই ফাঁপা আওয়াজ পাওয়া যাইতে-ছিল—অন্যত্র কিন্তু সেরূপ শব্দ না হইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল—অনেক চিন্তার পর ডাক্তার বলিলেন, যখন ভিতর হইতে সেই গুপ্ত পথের কোন সূত্র পাওয়া গেল না—তখন একবার বহির্দ্দেশটা দেখাও আবশ্যক, দুজনে বাহির হইয়া মন্দিরের পশ্চাৎভাগে যাইলাম—সেখানটা বন্য লতাগুল্মে আবৃত ছিল—কিন্তু প্রথমেই সেস্থানটার মথিত ভাব আমাদের লক্ষ্য হইল—দেখিয়া বেশ বুঝিলাম যে এখানে লোক-চলাচলের চিহ্ন বিদ্যমান—লাঠী দিয়া ঝোপ ঝাপ ঠেলিয়া দেখিলাম মন্দিরের পশ্চাৎস্থ কোণে এক খণ্ড প্রকাণ্ড চৌকা পাথর পড়িয়া রহিয়াছে—ডাক্তার বলিলেন এই সন্‌ফিউএর যাতায়াতের পথ। লাঠীর ডগার বল্লমের ফলা দিয়া নাড়াচাড়া করিতে পাথরটা একটু নড়িল—দুজন ধরিয়া তুলিতেই দেখিলাম—প্রকাণ্ড অন্ধকারময় গুহার সম্মুখে

আমরা দণ্ডায়মান। ডাক্তারবাবু পকেট হইতে বৈদ্যুতিক আলোক বাহির করিয়া জ্বালিলে দেখিলাম সেই গুহা মধ্য হইতে নিম্নে সোপান শ্রেণী বর্ত্তমান—যদিও গুহার মুখ খুব ছোট কিন্তু ভিতরে খুব প্রশস্ত।

বন্ধুবর ডাক্তারের গাত্র হইতে তড়াক্ করিয়া এক লাফে নামিয়া গুহার মধ্যে আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল—ডাক্তার বলিলেন শেখর পিস্তল হাতে তৈয়ার রাখিবে—সে যদি এর মধ্যে থাকে তবে আমাদের পলকের ও অবকাশ দিবে না—এটা স্মরণ রাখিবে—এক হাতে পিস্তল ও অপর হস্তে বৈদ্যুতিক আলো লইয়া ডাক্তার ভিতরে নামিলেন—তাঁহার লাঠীটে বাহিরেই রহিল আমি এক হস্তে লাঠী ও অপর হস্তে রিভলবার লইয়া তাঁহার পাছু পাছু নামিতে লাগিলাম—কিছুদুর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম কোথা হইতে ক্ষীণ সূর্য্য রশ্মি আসিতেছে—ক্রমশঃ আলোক স্পষ্টতর হইল—দেখিলাম পাষাণ নির্ম্মিত এক কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলাম ; তথায় জনমানব নাই তবে মানবের অস্তিত্ব জ্ঞাপক অনেক চিহ্ন রহিয়াছে—এককোণে স্তূপীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে ঘরের একস্থানে আগুনের ছাই স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে—” দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একখণ্ড সদ্যহত জন্তুর মাংস পড়িয়া রহিয়াছে—আর একখানা ভোজালী রক্তমাখা অবস্থায় তাহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে—দেখিয়াই বুঝিলাম এ সেই রোগীর কক্ষে নিক্ষিপ্ত ভোজালীর জোড়া ; এবং এ যে সন্‌ফিউর আড্ডা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ডাক্তার সব দেখিয়া বলিলেন “তাই তো শেখর পাখী যে পলাইল তার কি ?” আমি বলিলাম “কোথা দিয়ে পালাল এর তো আর রাস্তা আছে বলে বোধ হয় না” “নিশ্চয় আছে এস দেখি” বলিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন; ঘরের একপার্শ্বে একটী জানালা বন্ধ ছিল সেটা খুলিয়া ফেলাতে এক ঝলক সূর্য্য কিরণ আসিয়া ঘরে পড়িয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াদিল, তাহাতে দেখিলাম যে এককক্ষে আসিবার পথ ভূগর্ভমধ্যস্থ হইলেও কক্ষটী বেশ ফাঁকা জমির উপর, চতুর্দ্দিক খোলা। জানালার নীচে চাহিয়া দেখি প্রায় ১০।১২ হাত নীচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকত। জানালাটী নাড়াচড়া করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম জানালার একটী গরাদে নাই; বুঝিলাম কোনরূপে আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া সেই কৌশলী চৈনিক এই জানালা দিয়া লাফাইয়া পলাইয়াছে। এত কষ্ট বৃথা হইল দেখিয়া বড় নিরাশ হইলাম, ডাক্তার বলিলেন "যাই হোক এত দূর এসে আর শুধু হাতে ফেরা উচিত নয়, ভোজালীখানা নিয়ে চল কিছু উপকার হবে অন্ততঃ ওটা আর ছুঁড়ে মার্ত্তে পার্ব্বে না" অগত্যা ভোজালীখানা লইয়া আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম আসিবার সময় গুহামুখে সেই পাথরটী আবার চাপাইয়া দিলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা চলিয়া আসিলাম—তখন আকাশে মেঘ সঞ্চার হইতেছিল—সেই মেঘ ক্রমশঃ গাঢ় মসীরমত আকাশময় ভরিয়া গেল—বুঝিলাম আজ বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী; ডাক্তার রোগীর কক্ষে যাইলেন এবং আমার রাত্রি ১২টার সময় তাঁহাকে খাবার দিবার জন্য বলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল, সেরূপ প্রবল বর্ষণ আমার জীবনে কখনও দেখি নাই; তীরের মত বারিধারা যেন ধরণী বিদীর্ণ করিয়া দিতে লাগিল—আর একটা অবিরাম ঝন্ ঝন্ শব্দে চতুর্দ্দিকে যেন প্রলয় বাদ্য বাজিতে লাগিল। আমি একটা খোলা জানালা দিয়া এই ভীষণ বর্ষণের ভয়ঙ্কর শোভা একাগ্রচিত্তে দেখিতে ছিলাম—কোথা হইতে একটা বিপুল পুলক আসিয়া আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত—তরঙ্গায়িতসিন্ধুর মত বিক্ষুব্ধ করিয়া দিল। হৃদয়ে যেন অভাবের বিপুল দৈন্যতা বাজিতেছিল—বৃষ্টি দেখিলে যে মনের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা জানিতাম না—ভাল করিয়া বৃষ্টি কখনও দেখি নাই—বৃষ্টিতে অনেকবার ভিজিয়াছি মনে পড়িল, শৈশবে গুরুজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বৃষ্টিতে কত ছুটাছুটি করিয়াছি, পায়ে করিয়া জল ছিটাইয়া সহচরদিগের গায়ে দিয়াছি, তাহাতেও এক প্রকার আনন্দ পাইয়াছি কিন্তু এতে আর তাতে কত তফাৎ। অরণ্যসঙ্কুল দেশে এমন ভীষণ ধারাবর্ষণ দেখিবার সুযোগ কখন ও হয় নাই—এমন করিয়া সহস্র সহস্র প্রবল ধারাপতন দেখিবার সুযোগও হয় নাই সুতরাং এই অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিত আনন্দ যে বিশেষরূপে উপভোগ করিব তাহাতে আর বিচিত্র কি কি? আর একটা নূতন ব্যাপার আজ লক্ষ্য করিলাম— সেটা জড়প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, এ-দুটা জিনিষের সঙ্গে যে পরস্পর এত নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহার কোন ধারণা আমার ছিল না। এখন দেখিলাম জড়জগতও জীব জগত একটী সূক্ষ্ম বন্ধনে আবদ্ধ— তাহাদের মধ্যে একটী অদৃশ্য সহানুভূতির সূত্র বিরাজিত; ক্রমশঃ

নিরুপমা-পুরস্কার।

রাত্রি হইল, বৃষ্টিরও বিরাম নাই ; অন্ধকারেরও হ্রাস নাই ; বরং রজনী-সমাগমে মেঘের রং যেন আরো কাল হইয়া উঠিল—মধ্যে মধ্যে কেহই কালমেঘকে চৌচির করিয়া ফাটাইয়া রজতশুভ্র বিদ্যুতালোক ক্ষণিকের মত দেখাদিয়া আবার গাঢ় অন্ধকারে ধরণীকে যেন মুড়িয়া দিতেছিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইলাম, বৃষ্টির দৌলতে আজকে যে গাঢ় নিদ্রা হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না তবে রাত্রি বারটায় ঘুম ভাঙ্গিবে কি না, সেই ভাবনায় একটু বিচলিত হইতে লাগিলাম। এ দিক সে দিক্ ভাবিতে ভাবিতে কখন যে নিদ্রার স্নেহময় কোলে স্থান পাইয়াছিলাম তাহা জানিনা—হঠাৎ অনেক রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গিল ; তখন শুনিলাম যেন ডাক্তার শঙ্করলাল আমায় ডাকিতেছেন—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলাম ডাক্তার হতবুদ্ধির মত দণ্ডায়মান—তাঁহার মুখ দারুণ ভয়ের ছায়ায় যেন অন্ধকার—চোখ দুটী যেন বিস্ময় ও ভয়ে বড় বড় হইয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে—আর তাহার ডান হাতের বিদ্যু-তিক আলোকে সমস্ত দালানটা আলোকিত আর—সম্মুখে ও কি ? সে বীভৎস দৃশ্য এজীবনেও ভুলিতে পারিব না—মিশিরজীর মৃতদেহ ; তাহার দুচোখের তারাদুটা যেন উল্টাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে জিহ্বা অর্দ্ধেকের উপর নির্গত, আর গলাটা এমন বীভৎসভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে—যে সে মনে হইলে এখনও হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করে ; গলা শুখাইয়া কাঠ হইয়া যায়। ডাক্তারী করিতে অনেক সময় মৃত রোগীর বিকৃত দেহ দেখিয়াছি কিন্তু এই দৃশ্যের কাছে সে কিছুই নহে—এ যেন মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা—ডাক্তার ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ

হইয়া বলিলেন "শেখর অত আত্মহারা হইলে চলিবে না—এ-নিশ্চয় সেইই সন্‌ফিউ এর কাজ, নতুবা এমন মানুষকে হৃদয়হীন পিশাচের মত হত্যা করিতে অন্য কেহ পারে না—এস একবার দেখি ওর কোন আশা আছে কি না—অতি সন্তর্পণে দুজনে সেই মৃতদেহের কাছে যাইলাম—নাড়ী দেখিলাম, বুক দেখিলাম, বুঝিলাম প্রাণবায়ু অনেকক্ষণ বহির্গত হইয়াছে আর কোন আশা নাই। একটা কম্বল ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া তাহাকে আনিয়া চাপা দিলাম। তারপর দুজনে ধীরে ধীরে রোগীর কক্ষে আসিলাম, মনটা এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে আর কথা বলিতে ইচ্ছা ছিল না—নিরীহ ব্রাহ্মণ চাকরী করিতে আসিয়া আমাদের জন্য অকারণ প্রাণ খোয়াইল, ভাবিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। ডাক্তার বলিলেন" শেখর! কিছুতেই যে এর প্রতিকার কর্ত্তে পারছি না—উপায় কি? আজ তাহাকে ধরিয়াও ধরিতে পারি নাই—তাহার ভোজালীখানা পর্য্যন্ত আনিলাম কিন্তু তবুও দেখ তাহার অত্যাচার বন্ধ করিতে পারিলাম না—বারটা বাজিল অথচ তুমি আসিলে না দেখিয়া রোগীর ঘরে তালা দিয়া আমি ইলেকট্রিক বাতী জ্বালাইয়া দালানে গিয়াই দেখি এই বীভৎস দৃশ্য, আমার এমন হইয়া গিয়াছিল যে তোমার ডাকিবার শক্তিও যেন আমার ছিল না—আমার অনুমান হচ্ছে সন্‌ফিউ আমাদের অনিষ্টোদ্দেশ্যে এখানে রাত্রে আসে। হয় ত অন্ধকার দালানে যেতে যেতে ঠাকুরের ঘাড়ে পড়ে যায়, তাতে হয় তো ও তাকে ধরেই ফেলুক বা চেঁচিয়েই উঠুক যাহোক একটা কিছু হয়; তাতেই সে ওকে গলাটিপে মেরে ফেলে পালিয়ে গেছে—বোধ হয় তার কাছে অস্ত্র শস্ত্র কিছু আর ছিল না—যাইহোক্ ওর ঠিকানাটা সালোয়ার কাছ থেকে জেনে নিয়ে

দেশে ওর মৃত্যুসংবাদ দিবার আর এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে—অনর্থক একটা মানুষ মারা গেল—বড় দুঃখের বিষয়—আমি উঠি, দেহটার একটা গতি করিগে—ওটা ঘরের মধ্যে রাখা আর ভাল নয়।" "এত রাত্রে আর কি করবেন—" দেখি চৈতন্যকে নিয়ে ওটা বার করে যদি গাঙে ফেলে দিতে পারি—" "খবরদার অমন কাজ করবেন না—যা করবার কাল ভোরে করবেন। আজ রাত্রে আর কোন কারণে বাড়ীর বাইরে যাবেন না—সন্‌ফিউ এখন বোধ হয় এখন বুভুক্ষিত ব্যাঘ্রের মত বাড়ীর চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এখন কিছুতেই বারহওয়া হবে না—"আচ্ছা তুমি যখন এত করে বারণ কর্চ্ছ—তখন ওটাকে অন্য কোথাও নেড়ে চাপা দিয়ে রেখে আসি—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি কক্ষে অর্গল বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম মিশিরজীর তুলসীদাসের রামায়ণ পড়া ব্রহ্মণ্যদেব তাহাকে পিশাচের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই—আর ভাবিলাম সেই নৃশংস এক চক্ষুহীন সন্‌ফিউর কথা—তার গায়ের বিপুল শক্তি সামর্থ্যের কথা—অত বড় লম্বাচোড়া দেহ মিশিরজীকে কেবল গলা টিপিয়া মারা সোজা কথা ছিল না—এবং মৃত্যু সম্মুখীন দেখিয়া সে যে নিশ্চেষ্ট ছিল তাহাও বোধ হয় না। এক এক সময় মনে হইতে লাগিল যে এই কাণা চীনাম্যানের দৈহিকশক্তি বুঝি ডাক্তার শঙ্করলাল অপেক্ষাও অধিক—ভগবান না করুণ যদি কখনও উভয়ে সম্মুখীন হয় তবে যে সেটা ডাক্তারের পক্ষে নিরাপদ হইবে না তাহা অবধারিত। আর একটা কথা বুঝা গেল যে সে এইবারে সত্যই নিরাশ

হইয়াছে নতুবা এই রক্তপিপাসু ভীষণ প্রতিহিংসক চৈনিক অস্ত্র হাতে থাকিলে কখন তাহা ব্যবহার না করিয়া দৈহিক বল প্রয়োগ করিত না।

ভোর হইবামাত্র ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "যাও শেখর বিশ্রাম করগে"—আমি বলিলাম "লাসটি কোথায় তাহার কি গতি করিব?" "সে আমিও চৈতন সমুদ্রমুখে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি তবে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা সালোয়াকে বলিবার আবশ্যক নাই—তা হইলে সে ভয় পাইবে তাহাকে জানাইবে সে পলাইয়া গিয়াছে তাহার দেশের ঠিকানাটা, খোঁজ করিবার অছিলায় জানিয়া লইবে।" আমি চলিয়া গেলাম আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এবার আবার কার পালা? কেবল সালোয়ার জন্যই আমার বিশেষ ভয় হইতেছিল—তাহার না কোন অনিষ্ট হয়—সে দিকে খুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোরবেলা উঠিয়া রোগীর কক্ষে যাইয়া দেখিলাম—ঘরটী একেবারে শূন্য সে সব যন্ত্রাদি কিছুই তথায় নাই; কোণ হইবে সে সিন্ধুক কোথায় চলিয়া গিয়াছে—বন্ধুবরের বাসগৃহ রূপী সে ঝাঁপি নাই—সে টেবিল চেয়ার, থারমমিটার, ষ্টোভ কিছুই নাই; গৃহের মধ্যস্থলে সেই তক্তাপোষে খুব নরম বিছানায় শাদা চাদর মুড়িদিয়া রোগী ঘুমাইতেছে। মুণ্ডিত মস্তকটীকেবল-মাত্র দেখা যাইতেছে তাহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ কেশোদগাম হইয়াছে। কেশের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আজকাল একমাত্র "নিরুপমা" ব্যবহারেই যে হওয়া সম্ভব তাহা মনে পড়িল। আমায় দেখিয়া ডাক্তার হাস্যমুখে

বলিলেন "এস শেখর—আজ তোমার রোগী তোমার সঙ্গে কথা কহিবে। আমি বলিলাম "সত্য নাকি—তাহলে বলুন এতদিনে অসাধ্য-সাধন হইল।" "অত ব্যস্ত হয়োনা শেখর—এক একটী অনুশীলন মাত্র—সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষায় যদি এ উত্তীর্ণ হয়, তবেই এটাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে—" "এখনো কি আপনার কিছু সন্দেহ আছে" "কি জানি দেখই না বলিয়া তিনি রোগীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন; তিনবার এইরূপ করার পর তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন "দুর্গাদাস ওঠ—চোখ চেয়ে দেখ দিকি?" নিদ্রাচ্ছন্নের ন্যায় রোগী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল। আমি দেখিলাম একটী সুন্দর বলবান যুবক বসিয়া; ডাক্তার বলিলেন "আমায় চিনিতে পারিতেছ!" চোখ খুলিয়া বিহ্বলের ন্যায় একবার ডাক্তারের মুখের দিকে, একবার আমার মুখের দিকে, একবার ঘরের দেয়ালগুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখ্‌লে কিন্তু যেই ডাক্তারের সঙ্গে চোখো চোখী হইল অমনি যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "হুঁ—তুমি হচ্চ আমার বন্ধু ডাক্তার শঙ্করলাল" "বেশ! আর এঁকে চিন্‌তে পার্চ্চ" আবার সেই উন্মাদের মত অর্থহীন চহনি—সে চাহনীটা যেন অতীতের সুপ্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের দারোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে—তার একটু পরে যেন যন্ত্রচালিতের মত বলিল "হুঁ ইনি ডাক্তার শেখরকুমার বসু, এঁকে আমি পৌত্রী সম্প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" লজ্জায় আমি ঘাড় নীচু করিলাম—আমি ভাবিলাম ডাক্তারের জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল ফলিয়াছে, সত্যই মৃত্যুর দ্বার হইতে মানব নবযৌবন ও পুনর্জীবন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে কেবল রোগীর ঐ অর্থ-

হীন—উন্মাদের ন্যায় উৎসুক চাহনীটা আমার বিসদৃশ ঠেকিতেছিল—সে চাহনীটাতে যেন একটা পাশবিক বীভৎসতা মাখান ছিল। ডাক্তার বলিলেন "যাক্ আবার ঘুমিয়ে পড়" দুএকবার যেন অসম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিয়া যেমন ডাক্তারের সঙ্গে চোখোচোখী হইল অমনি যেন জড়সড় হইয়া গুটাইয়া শুইয়া পড়িল। ডাক্তার আবার তাহার পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ তিনবার হস্তামর্ষণ করিলেন—রোগী পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ডাক্তারের মুখখানা যেন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল আমায় বলিলেন "কিছু বুঝলে শেখর।" আমি বলিলাম "বুঝিবার আর তো কিছু দেখি না রোগীকে ত সুস্থ সবল বোধ হচ্ছে আর জ্ঞানও তো বেশ হয়েছে।" "ছাই হয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে শেখর আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে—আমার আজীবনের উদ্যম ভগ্ন—বিধ্বস্ত—আমি কি কর্ব্বো?" বলিয়া বালকের ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইতে দেখি নাই তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমার প্রাণটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল আমি তাঁহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলাম "আপনি তো কখন ধৈর্য্য হারান না—আজ এমন কচ্চেন কেন—কিন্তু কিছু খারাপ হয়েছে বলে তো মনে হচ্চে না" "ঠিক্ ঠিক্! বলেছ শেখর, কাঁদলে দুর্ব্বলতা বাড়ে, কাঁদলে তো চলবে না; এখনে যে আমার আরও বেশী শক্তির আবশ্যক—এখন অধীর হয়ে যদি শক্তিহারা হই তো শুধু আমার জন্য তাহারই জীবনের গুরুতর আশঙ্কা হয়ে পড়বে—" আমি বলিলাম "কেন কি হলো বলুন না। আমি যে কিছু বুঝতে পার্চ্চি না—আমার দ্বারা যদি কোন—"

"সাহায্য, অসম্ভব—যতটুকু তোমার জ্ঞানের ভিতর ছিল তুমি সাহায্য করেছ কিন্তু এখন আরও বিজ্ঞানের রাজত্বের সীমায় নেই—বিজ্ঞান ওকে যা দেবার তা দিয়েছে, সবল দেহ পরিপূর্ণ যৌবন—দীর্ঘজীবন—কিন্তু ও কি হারিয়েছে জান—চৈতন্য—জ্ঞান! যার অস্তিত্বে মানব ও পশুতে এত প্রভেদ। আমি শিব গড়তে বাঁদর গড়ে বসেছি, ওর চোখে দারুণ পাশবিক প্রবৃত্তির স্পষ্ট ছাপ দেখ্‌লে না, একটী অজর অমর সুন্দর মানুষ সৃষ্টি কর্ত্তে গিয়া আমি একটী সুন্দর দেহধারী ভীষণ পশু সৃষ্টি করেছি—দেহ যৌবন জীবন আমি ফিরিয়ে এনেছি—কিন্তু ওর আত্মা যে দেহছেড়ে চলে গেছে তাকে কে ফিরিয়ে আন্‌বে সে তো বিজ্ঞানের দান নয়—সে তো আমার ঈঙ্গিতে ফিরে আস্‌বে না।" "তাহলে আর কোন আশা নেই বলুন, এত কষ্ট সব সত্যই ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর দৃষ্টিটা অবশ্য আমার ভাল লাগছিল না কিন্তু ওর কথা শুনে বোধ হচ্ছিল ওর জ্ঞান আছে তবে হঠাৎ অনেকদিনের পর জ্ঞান পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল।" "কথাগুলো তো ওর অন্তরের কথা নয় আমার ইচ্ছা শক্তিতে ওর পশু প্রবৃত্তিকে দমন করে আমার কথা ওর মুখ দিয়ে বার করালুম মাত্র—এখনো যা তিলমাত্র আশা আছে তা ঐ যতদিন আমার ইচ্ছা শক্তি প্রবল থাকবে—ওকে পরিচালিত কর্ত্তে পার্ব্বো, ততদিন কোন বিপদের আশঙ্কা নেই তবে 'আত্মার' প্রতিষ্ঠা করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার, তার জন্য আমাকে হয়ত আবার দীর্ঘকাল যোগসাধনা কর্ত্তে হবে—একমাত্র তান্ত্রিক সাধনায় এই শক্তি পাওয়া যায়, সেই ভেবেই আবার উঠে দাঁড়াচ্ছি—তবে যদি কোন বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ও আমার ইচ্ছাশক্তির বাইরে গিয়া পড়ে, তখন কিন্তু আর ওকে

সামলাইতে পার্ব্বো না।" আমি এই সব শুনিয়া বড় দমিয়া পড়িলাম। মানুষটাকে নৈরাশ্যের আঘাত যে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিতেছিল তাহার ক্ষুণ্ণক্ষীণ আর্ত্তনাদ যেন আমার শ্রুতিগোচর হইল, কিন্তু উপায় কি! সত্যই তো জীবদেহে যে প্রাণ ছাড়া আর একটা 'আত্মা' নামক পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, সেটা গোড়াতে কি কাহার মনে আসে নাই; আর এই আত্মা যে কাহারও আজ্ঞাধীন নহে সে অক্ষয়, অনন্ত, অব্যক্ত, চিরমুক্ত, স্বেচ্ছাধীন, সে তো কাহারো ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবে না, সে তো কাহার অনুরোধ শুনিবে না সে তো পরদুঃখকাতর হইয়া পরোপকার করিতে ফিরিয়া আসিবে না—সে যে ইন্দ্রিয়াদি সকল বিষয়-বর্জ্জিত, সে যে নিষ্কাম, কিছুতেই তাহার আসক্তি নাই; সে যে সদা নির্লিপ্ত, সেই তো পূর্ণব্রহ্ম—সেই তো ভগবান্; তাকে ধরে আনা তো মানব বিজ্ঞানের কাজ নয়। এখন ভাবিলাম পঠদ্দশায় যে মুনিঋষির তপজপের কাহিনী উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম—অবিশ্বাস করিয়া শ্লেষের হাসি হাসিতাম, তাহা সত্যই আমরা স্বল্পবুদ্ধি বলিয়া, নিজের বুদ্ধির বাহিরের যা কিছু জিনিস সবই যেন উপহাসের, সেটা যে নিজেদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির শূন্য আত্মম্ভরিতার লক্ষণ, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। ঠেকিয়া না শিখিলে কখন শিখা যায় না, যে আগুনে কখন পুড়ে নাই তাহার সেই অগ্নিদাহের জ্বালা-অনুভবের বর্ণনা করার মত, যে বোঝে নাই তাহার বুঝাইবার চেষ্টার মত—যে শুনে নাই তাহার শুনানর মত, যে দেখে নাই তাহার দেখানর মত—ভিক্ষুকের ঐশ্বর্য্যকল্পনার মত, শিশুর চন্দ্র ধরিবার নিস্ফল প্রয়াসের মত কেবল হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে কিন্তু শিক্ষা তাহাতে হয় না।

ডাক্তার অনেকক্ষণ উদাস নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার মুখখানি দেখিলে বোধ হইত তাঁহার মনটী যেন চিন্তারূপে লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় সুদূরে—অনন্ত নীল আকাশের কোলে উধাও হইয়া গিয়াছে; হঠাৎ চমকভাঙ্গার ন্যায় উঠিয়া বলিলেন "এখন ও বেশ ঘুমাইবে—সকালবেলা আমি দুধ খাওয়াইয়াছি আর কিছু করিবার নাই ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া দাও; সন্ধ্যার পর আবার দুজনে আসিয়া দেখিব। দেখি পুঁথিটুঁথি ঘেটে যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি, আমায় সন্ধ্যার ভিতরে আর কেউ ডেকো না; হ্যাঁ দেখ আর এককথা এঘটনার মৃদু আভাস সালোয়াকে দিয়ে রাখবে কারণ সত্যই যদি কিছু করে উঠ্‌তে না পারি শেষটা যেন তাকে আঘাতটা সাংঘাতিক হয়ে না লাগে" বলিয়া ধীর পদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন আমিও জানালা বন্ধ করিয়া দ্বারে তালা দিয়া চলিয়া গেলাম।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দারুণ দুশ্চিন্তায় ও গোলযোগে আসল কথাটী ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মিশিরজীর অবর্ত্তমানে দক্ষিণ হস্তের কি ব্যবস্থা হইবে সেটা একবারও ভাবিয়া দেখি নাই ভাবিলাম গরীবের ছেলে যাহোক দুটা সিদ্ধপক্ক করিয়া লইব কারণ এ কাজ সালোয়ার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব। সে ধনীর পৌত্রী চিরকাল দাসদাসী পরিবৃতা হইয়া পরমযত্নে লালিতা পালিতা বোধ হয় রন্ধনশালার অভ্যন্তর কখনও ভাল করিয়া দেখে

নাই। আর অন্য পাচক এ অরণ্যরাজ্যে পাওয়ার তো কোন আশাই নাই ; এই ভাবিয়া রন্ধনশালার দ্বারদেশে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখি, উনানে হাঁড়ি চাপান—আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, নিকটে সিঁড়ির উপর বসিয়া অন্নপূর্ণারূপিণী সালোয়া। এই উচ্চশিক্ষিতা সভ্যতালোক-প্রাপ্তা ধনীর পৌত্রীটি যে এ বেশ ধরিতে পারে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম ; এই মধুর ছবিটি এই বৃদ্ধ বয়সেও যেন চোখের সামনে সদাই সজীব আছে—চৈতন্যগৃহিণী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মাষ্টারী করিতেছিলেন, আমায় দেখিয়া একটু তফাতে চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম রন্ধনে অনভিজ্ঞা বালিকা তাহার পরামর্শের ভরসায় অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়াছে, ধোঁয়ায় পদ্মপলাশলোচন দুটী লাল হইয়ছে, অশ্রু-ধারায় অভিষিক্ত সেই পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রের মত ক্ষুদ্র ললাটে মুক্তাহারের মত স্বেদবিন্দু আবির্ভূত—পরিধেয় শাটীর কোথাও জলসিক্ত—কোথাও ধূলিলিপ্ত আর কোথাও হরিদ্রারঞ্জিত। জলের ঘটীটী বোধ হয় উল্টাইয়া পড়িয়াছিল—মেঝের কতকটা কর্দ্দমাক্ত—এত দুর্দ্দৈবের মধ্যেও পুষ্পপুট তুল্য অধরদ্বয় যেন গর্ব্বের হাস্যে উদ্ভাসিত! মরি মরি! কি মোহিনীমূর্ত্তি! হায় হতভাগা বাঙালী কোন পাপে—এমন অন্নপূর্ণামূর্ত্তি দর্শনে আজ তোমরা বঞ্চিত? এই নয়নানন্দদায়িনীর অমৃতময় করস্পর্শে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনের অমৃতাদপিগরিয়সী সুমধুর স্বাদে বঞ্চিত হইয়া দদ্রু-রোগগ্রস্ত বাঁকুড়াবাসী গঞ্জিকাসেবী মলিনবসনধারী প্রকাণ্ড টেরীশোভিত মস্তক ব্রাহ্মণের বা মহাপ্রভুর দেশের "ড়"বহুল ভাষী, ছিটে ফোঁটা, কাটা উড়িষ্যা নন্দনের বা দ্বারভাঙ্গাবাসী কট্‌মট্ হিন্দীভাষী ভাঙ্গবিলাসী আচারবিরহিত হিন্দুস্থানীর সিদ্ধ অজীর্ণতাজনক রুচিপ্রশমক বমনোদ্রেক-

কারী অন্নব্যঞ্জন গিলিয়া কৃশদেহী অল্পায়ু হইতেছ! সাধ করিয়া অন্দরে সভ্যতা ঢুকাইয়াছ এখন তাহার বিষময় ফল সেবনে নীলকণ্ঠের মত কণ্ঠস্থ বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছ! বলিবার তো কিছু নাই, নিজেরা খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিয়াছ এখন তাহার গ্রাস হইতে কেহ তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না। কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হইবে বই কি!

সালোয়া আমায় দেখিয়া বলিল "আর বেশী দেরী নাই—ভাত হয়ে গেছে ঝোল চড়িয়েছি—চৈতনদা আজ বেশ ছোট ছোট খয়রা মাছ ধরে এনেছে—তার ক'টা ঝাল দিয়ে করব" আমি হাসিয়া বলিলাম "বিবি পাণ্ডব—আমি তাগাদায় আসি নাই তবে অন্নপূর্ণামূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছি।" "যাও আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না—কেন আমি কি রাঁধতে জানি নাকি—" "কেন জানবে না—সেই ছেলেবেলায় রাঁধুবাড়ু খেলতে বোধহয় সেই—আর এই, কেমন্?" "হ্যাঁগো হ্যাঁ—রান্না আবার ভারি কাজ—দিদি দেখিয়ে দিচ্ছেন আমিত রাঁধ্ছি, তবে খেতে কেমন হবে—" "অমৃত—অমৃত সে আমি দেখেই বুঝছি—তবে সৌভাগ্য এই যে ফেন্ গালতে গিয়ে হাতপা পোড়াওনি—নইলে আবার ডাক্তার ডাক্‌তে হোত" "ডাক্তারের অভাব কি—ডাক্তার তো—" "আঁচলে বাঁধা—কি বল" "ছিঃ কি যে কর তার ঠিক নেই, ওখানে দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছেন" দিদি অর্থে—চৈতন্ত গৃহিণী। আমি বলিলাম "সে হিসাব আমার আছে গো—আমি খুব চুপি চুপি বলেছি।" "যাও এখন কাজের সময় নেক্‌রা কর্ত্তে হবে না" "ওঃ! কি আমার কাজের লোক রে।—আচ্ছা ভাই, তুমি রাগ করতো আমি যাচ্চি" বলিয়া যেমন চলিয়া আসিতেছি—

অমনি ঘরের ভিতর হইতে বলা হইল "দিদি দুধ খাবেন কি না জিজ্ঞাসা কর তো—তাহলে একটু গরম করি—এখানে এসে চা ফুরিয়ে অবধি চা তো আর খেতে পান্ না" প্রশ্নটা হইয়াছিল অবশ্য চৈতন্য গৃহিণীর মারফৎ, তথাপি আমি উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলাম "অমৃতে অসাধ বল কার" "সব তাতেই ঠাট্টা—ডাক্তার লোক এমন কেন বেশ গম্ভীর হবে বাবু তা নয়" বলিয়া সেই ব্রহ্মদেশবাসিনী তরুণী দুগ্ধ উত্তপ্ত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন—আমিও বাটীর বাহিরে চৈতন্যের অন্বেষণে আসিলাম—ভাঙ্গামহাল দুটা অতিক্রম করিয়া আসিতেই একটী গুন্ গুন্ ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলাম, চৈতন্য গান গাহিতেছে—একাজটীতে চৈতন্যের কখনও আলস্য দেখি নাই, সে যে কাজই করুক্ না কেন মায়ের নামটী দিনরাতই মুখে লাগিয়া থাকিত। বাহিরে ভাঙা রোয়াকে—যেটা পূর্ব্বে পুরীর সিংহদ্বার সংলগ্ন রোয়াক ছিল—বসিয়া, একটী লম্বা কঞ্চিতে আট্কান, অর্দ্ধ সমাপ্ত জাল বুনিতে বুনিতে চৈতন্য গাহিতেছে—

"সকলই মা ইচ্ছা তোমার, ব্রহ্মময়ী তারা তুমি
তোমার ইচ্ছায় সবই হয় মা—(পাপ) মনে বলে করে আমি
এই আমি—আমি—আমিটীকে বুঝতে তাকি পারি আমি
বুঝল পরে ভক্তিডোরে থাকতে বাঁধা দিনযামী"

সে এত তন্ময়তার সহিত জাল বোনা ও গান গাওয়া, দুটা এক সঙ্গে সম্পন্ন করিতেছিল—যে আমার আগমন সে লক্ষ্য করে নাই। যখন "কি হচ্চে চৈতনদা" বলে আমি তার পাশে ঘাসের উপর ঝুপ্ করে বসে পড়লুম, তখন সে যে চমক্‌ভাঙার মত ব্যস্ত হইয়া আমায় বসিবার জন্য রোয়াকের একঅংশ হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া বলিল "বসুন দাদাবাবু"

আমি উঠিয়া সেখানে বসিয়া বলিলাম "কেমন আছ চৈতনদা ? তোমার সঙ্গে ৩।৪ দিন দেখা হয় নি—রুগী নিয়ে ভারী ব্যস্ত ছিলুম" "তাতো দেখতেই পাচ্চি, বলি হ্যাঁ দাদাবাবু তোমরা যা কচ্ছ ওকি ভাল হচ্ছে গা—ডাক্তারবাবুর কথা ছেড়ে দাও তিনি তো দেবতা—তাঁর ক্ষ্যামতাও যেমন বুদ্ধিও তেমন—তবে আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—বলা ভাল দেখায় না— বলি ওই বুড়ো মানুষটাকে আবার বাঁচাবার জন্যে কেন এমন প্রাণ বের কর্চ্চ ? মানুষ বুড়ো হলে মর্ব্বেই, মানুষ মরে বলেই তো আবার মানুষ জন্মায়—আর যদি তোমরা চিকিচ্ছে করে মানুষকে মর্ত্তে না দাও, তাহলে মানুষের যে আর পিরথিমিতে জায়গা হবে না—মার যদি মনে তাই হোত তাহলে আরতো লোক মর্ত্তই না—এটা বাবু কিন্তু তোমাদের কি রকম কোট জানিনা—দেবতার উপর উঠ্‌তে যাওয়াটা কি ঠিক্ ? মা যে এতে রাগ কর্ব্বেন।" হরি, হরি ! এই নিরক্ষর গোপনন্দন বিশ্বাসে—অচলা ভক্তিতে, যে পরম সত্য আমার চক্ষের সামনে ধরিলে—তাহার উত্তর দিবার আমার সাধ্য কৈ ? বাস্তবিকই তো প্রকৃতির আবহমানকাল-প্রচলিত রীতিকে বিজ্ঞানের বলে ধ্বংস করিতে যাইলে প্রকৃতির পরিশোধ হইতে বিজ্ঞানকে কে রক্ষা করিবে—বিজ্ঞান প্রকৃতির দাস, সে কখন প্রকৃতির প্রভুত্ব করিতে পারে না। সুনীল গগনের ঘন নীল মেঘের আবরণে যে তড়িতলতা, সুন্দরী রমণীর ন্যায় নীলাম্বরী শাড়ীতে আবৃতা রহিয়াছে, তাহাকে কি বিজ্ঞান বন্দী করিতে পারে, কখন না—সে তাহার সাহায্য গ্রহণ করে, সে তাহাকে মেঘের বুক ফাটাইয়া কাড়িয়া আনিয়া চির বন্দিনী করিয়া রাখিতে পারে না—প্রকৃতির বক্ষে যত রত্ন লুক্কায়িত আছে বিজ্ঞানের

জ্ঞানালোক মানুষকে তাহা দেখাইয়া দেয়; তাহার সাহায্যে মানব আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লয় কিন্তু যেখানের রত্ন সেখানেই থাকে সে রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়া কেহ লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারে না। বীরাচারী সাধক শবাসনে সিদ্ধ হইয়া যখন দেবীর নিকট অভীপ্সিত বর পায় তখন সেই বরের প্রভাবে সে কি মদান্ধ হইয়া আদ্যাশক্তিকে ধ্বংস করিয়া তাঁর শক্তি স্রোতের নির্ঝরিণী রুদ্ধ করিতে পারে —কখন না—কখন না—এ যে দারুণ বাতুলতা—এ যে উন্মাদের কাছেও অসম্ভব! চৈতন বলিল "আজ আর মনটা তেমন যুত নেই দাদাবাবু এই দেখুন বামুনঠাকুরটার অপঘাত হলো—আহা বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়—আর মেয়েদের যে কি কষ্টে বুঝিয়েছি, যে সে দেশে চলে গেছে তা আর বলতে পারি না, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলেছি; কি করি নৈলে সে চেহারা দেখলে বা তার মরার কথা শুন্‌লে মেয়েরা কি আর বাঁচতো—ভয়েই মরে যেত!" আমি বুঝিলাম চৈতন আমার একটা কাজ হাল্কা করে দিয়েছে—সে যেমন সহজে মেয়েদের বোঝাতে পেরেছে আমি তা পার্ত্তুম না, কারণ তার মত সরলতা আমার ছিল না—আমি কৌশল করে ঢাক্‌তে গিয়ে হয় ত জেরায় নিজের কৌশলে নিজে ধরা পড়তুম। আদালতে একবার একটা মিথ্যাসাক্ষীর এই দশা হতে দেখেছিলুম—সে লোকটার পেশাই ছিল মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া—একটা মামলায় কিন্তু নিজের চালাকীতে নিজে এমন জড়িয়ে পড়ল, যে শেষে অত বড় জাঁহাবাজ সাক্ষী, যে দিনকে রাত কর্ত্তো, হয়কে নয় কর্ত্তো, শেষে তাকেও মিথ্যাসাক্ষ্যের অপরাধে শ্রীঘর যেতে হল। অতি চালাকের এই রকমই পরিণাম হয়—কারণ দু'চারবার কৃতকার্য্য

হলেই তার আত্মাভিমান জন্মায়, আর তার নিজের ক্ষমতার উপর তার অযথা বিশ্বাস হয়, তাতেই শেষে তার পতন হয়। আমি বলিলাম "চৈতনদা তুমি যা বললে সবই সত্য, বর্ণে বর্ণে সত্য—ও রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টাটা সত্যই আমাদের ভুল হয়েছে, কিন্তু কি জান মানুষ তার শক্তিকে বাড়াতে চেষ্টা করে সে কিছুতেই থাক্‌তে পারে না—বিশেষতঃ যারা শক্তিমান, তারা সাধারণ মানুষের মত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে থাকৃতে পারে না—সেটা তাদের পক্ষে অসম্ভব—তার প্রকৃতিগত শক্তিটা তাকে দিন রাত খুঁচিয়ে তোলে, যেন বলে, আমায় রাস্তা ছেড়ে দাও, সে যেন শেষে তার অনিচ্ছাতেও ঠেলে বেরিয়ে আসে।" "ঠিক কথা—দাদাবাবু সেইজন্যই তো মায়ের নাম নিতে হয় এক মনে মাকে ডাক্‌লেই তিনিই সুরাহা করে দেন—ঐ শক্তিই তখন ডাকের চোটে ভক্তি হয়ে ঠাণ্ডা হয়, তখন শক্তির কি আর তেজ থাকে—সে তখন গলে যেন জল হয়ে যায়—এই দুধ গরম হবার সময় কি রকম উথলে ওঠে দেখেছেন তো—যেন কড়া উপচে পড়ে যায়; কিন্তু পাশে বোসে যে ছোট মেয়েটী দুধ জাল দেয় সে যখন ফুঁবার আওটে দেয় অমনি দুধের ওথলান কমে, আবার কড়ার ভেতর চলে যায়; আর যখন জমে তখন হয় ক্ষীর—" "কি সুন্দর উপমা। এত বড় শক্তি তত্ত্বের সমাধান এমন সোজা কথায় এই সামান্য লোকটা যেমন করে বুঝিয়ে দিলে। তা আমরা ক্যাণ্ট, হিগেল, এমার্সন পড়ে পাঁচ বচ্ছরেও মাথায় ঢোকাতে পারি না—বুঝিলাম এ জ্ঞান সেই ভক্তিমার্গের—যা লাভ কর্ত্তে হলে ভক্তি ছাড়া আর কিছু আবশ্যক নেই—ভক্তি এসে আপনি তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়, আর সে দিব্য দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রহেলিকা-

তত্ত্ব স্পষ্ট দেখতে পায় ; তারজন্যে বই পড়বার আবশ্যক হয় না—যোগ-সাধন আবশ্যক হয় না—এই ভক্তিই তাকে পরম সন্তোষ, পূর্ণ নিবৃত্তির অধিকারী করে দেয়। ধন্য চৈতন্য ! ধন্য তুমি ! আর ধন্য বাঙালা দেশ! যে দেশের মূর্খ নিরক্ষর চাষারাও আজ অশিক্ষিত হয়ে অন্ধ বিশ্বাসে ভক্তিমার্গে আঁকড়ে ধরে দিব্যজ্ঞান লাভ করে ! যা শত শিক্ষাদীক্ষায় হয় না। এই দেশের মাটীতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্ম সম্ভব—যেখানে শিক্ষার তীব্র আলোক, সভ্যতার বিষের ঝলক জ্বল জ্বল করে, সেমাটীতে এ জিনিস জন্মায় না—সেখান ক্যাণ্ট হেগেল জন্মায়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্তদিনটা ঘুমাইয়াই কাটাইয়াছিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া রোগীর ঘরের দিকে যাইতেই দেখি দ্বার খোলা—ভিতরে একটা চেয়ারে ডাক্তারবাবু বসিয়া আছেন, গভীর চিন্তামগ্ন। শয্যায় রোগী সুখে নিদ্রা যাইতেছে কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাহার সেই বিকট ভাবটা মুখে যেন আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—প্রাতে যে ভাবের অঙ্কুর দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা বৃক্ষে পরিণত। আমি যাইতেই বলিলেন "শেখর বোস্" বলিয়া পার্শ্বস্থ একখানা চেয়ার দেখাইয়াদিলেন। আমি বসিলে বলিলেন "মুখের ভাবটা দেখছ তো—ওটা খুব ভাল নয়, ক্রমশঃই পশুপ্রকৃতির বৃদ্ধি হচ্চে—তবে এখনও একটু ক্ষীণ আশা আছে, আমাকে যোগসাধনা করে সিদ্ধ হতে হবে, তাহলে ঐ শরীরে

আত্মাস্থাপন কর্ত্তে পার্ব্ব তবে সে অনেক সময় সাপেক্ষ, ততদিন পর্য্যন্ত ওকে যদি আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন রাখতে পারি তবেই সেটা সম্ভব— সমস্ত পুঁথি আজ তন্ন তন্ন করে দেখেছি, এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই "সে এখন অনেক দূরে পড়ল—উপস্থিত ওকে আয়ত্ত রাখবার কি হবে? ওর শরীরের বলও যেরকম হয়েছে তাতে আমরা যে ওকে আর বেশীদিন চালিয়ে নিতে পার্ব্ব তাতো বোধহয় না।" "তার একটু পরীক্ষা করাই যাক্ না" বলিয়া তিনি উঠিয়া পাস্ দিতে লাগিলেন—আমি ততক্ষণে প্রদীপটা জ্বালিলাম। তিনবার পাস্ দিবার পর যখন রোগী চোখ্ চাহিল না, তখন ডাক্তার বলিলেন "দুর্গাদাস ওঠ্—চোখ চাও" রোগী নিরুত্তর—নিশ্চেষ্ট। আমি ভাবিলাম তবে কি রোগীর মৃত্যু হইল নাকি—কিন্তু মুখের আকার দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, তবে এখন ভাবিতেছি মৃত্যু হইলেই ভাল হইত—সেও জুড়াইত আমরাও জুড়াইতাম। কিন্তু বিধির বিধান লঙ্ঘন হইবার তো যো নাই—আমাদের অদৃষ্টে তখনও অনেক কষ্ট, অনেক কর্ম্মভোগ রহিয়াছে, তখন মরিলে সে সব ভোগ হইবে কি করিয়া! পুনঃপুনঃ আহ্বানেও যখন রোগী নড়িল না তখন ডাক্তার যেন একটু ভাবিত হইয়া পড়িলেন; পুনর্ব্বার পাস্ দিলেন, এবারে রোগী উঠিল— উঠিয়া শয্যা হইতে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া এমন কট্মট্ করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল যে এত প্রতিমুহূর্ত্তেই সে যেন আমাদের দংশন করিবে এরূপ আশঙ্কা হইতেছিল। ডাক্তার তাহার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, সেই কালানলবর্ষীচাহনীর দিকে চোখ্ রাখিতে না পারিয়া সে শামুকের মত সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া পড়িল। ডাক্তার যেই নাড়ী দেখিবার

জন্য তাহার ডানহাতখানি ধরিয়াছেন, সে অমনি পলকের মধ্যে তাঁহার বামহাতের কব্জীতে কামড়াইয়া লইল, তারপর নিজের হাত জোর করিয়া ছাড়াইয়া, দুইহাতে ডাক্তারের গলা টিপিয়া ধরিল—আমি ছুটীয়া তফাৎ হইতে তাহার হাতদুটা টানিয়া ধরিলাম ; ডাক্তার মুক্তি পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একটা দড়ি আনিয়া পিছন হইতে তাহাকে পিছ্‌মোড়া করিয়া বাঁধিলেন—তখন সে উন্মত্তের মত বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, তাহা যেন ক্ষিপ্ত শৃগালের কণ্ঠধ্বনির মত বিভীষিকাময়। দুজনে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় তুলিয়া বিছানার চাদর দিয়া শয্যার সঙ্গে বন্ধন করিলাম ; ডাক্তার বলিলেন "তুমি এক মিনিট বোস্ আমি ঔষধ লইয়া আসি বলিয়া বাহিরে গেলেন সেই একমিনিট সময় যে তখন আমার কত দীর্ঘ, কত দুঃসহ বোধ হইতেছিল তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তার আসিয়া লোহারপাত দিয়া তাহার দাঁত ফাঁক ধরিলেন, আমি তাঁহার হস্তস্থ ঔষধ লইয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিলাম আরও ৩।৪ মিনিট চেঁচাইয়া সে অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন উপায় কি শেখর। আমি তো বিষম বিপদে পড়িলাম। দেখেছ আমার ইচ্ছাশক্তির বাহিরে সে চলে যাচ্ছে—আর ঔষধ দিয়ে একে কদিনই বা অজ্ঞান করে রাখব, দু একদিন না হয় চলে কিন্তু চিরকাল তো আর সে সম্ভব নয়—এ না মনুষ্য না পশু, উন্মাদ হইলে তাহার ঔষধ ছিল, এতো উন্মাদ নয় এ আমার নির্ব্বুদ্ধিতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। আমার জ্ঞান আমায় যে শক্তি দিয়েছিল সে যেন আজ বেরিয়ে এসে এই কিম্ভূতকিমাকারমূর্ত্তিতে আমাকে উপহাস কর্চ্ছে! শেখর এর চেয়ে আমার মৃত্যু যে ভাল ছিল—এখন সালোয়াকে আমি মুখ

দেখাব কি করে ? আমি যে তাকে বড় আশা দিয়ে এত কষ্ট সহ্য করিয়ে নির্জ্জন বনপুরীতে এনে কষ্ট দিচ্ছি—তোমার কথা ধরি না তুমি সব স্বচক্ষে দেখেছ, তুমি তো বুঝতে পাচ্ছ আমার যত্ন বা চেষ্টার ত্রুটী হয়নি কিন্তু তাকে তা কি করে বোঝাব ; সে তো এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে পাগল হয়ে যাবে, শেখর পৃথিবীতে আমার আপনার কেউ ছিল না স্ত্রী পুত্র পরিবার কখন ছিল না—শৈশবে পিতৃমাতৃহীন—পিতৃমাতৃ স্নেহের আস্বাদ কখনও পাই নাই—স্ত্রীর প্রেম, পুত্রকন্যার ভক্তি যত্ন কখন পাই নাই, চাইও নাই ; কিন্তু মানুষের হৃদয় তো সত্য পাষাণের মত শুষ্ক হয় না, আমার সমস্ত সঞ্চিত স্নেহ দিয়ে আমি সালোয়াকে ভালবেসে ছিলুম, সে আমার কন্যাই বল আর পৌত্রীই বল যা কিছু সব। বাহিরে অবশ্য কখন কিছু প্রকাশ করি নাই, কারণ স্বভাবতই আমি নীরস, কর্কশ ; কিন্তু তা বলে অন্তর বলে একটা পদার্থ তো রয়েছে তা না থাক্‌লে আমিও ঠিক ঐ ওর মত হতাম।" বলিয়া নিদ্রিত দুর্গাদাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাথা নীচু করিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন। এ দারুণ মর্ম্মবেদনার কি শান্তি আছে, এ নৈরাশ্যের কি সান্ত্বনা আছে, এ মনোভঙ্গের কি ঔষধ আছে, এ বেদনা কি দুটো মুখের কথা বলিলে প্রশমিত হওয়া সম্ভব—জানি তা নয়, তবুও এত দুঃখে দুটা সহানুভূতির মিষ্টিকথা না বলিলে লোকটা যে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়! তাই বলিলাম "দুঃখ কর্ব্বেন না ডাক্তারবাবু জগতের গতিই এমন লীলাময়ী, আপনি ওর জন্য যা করেছেন তা মানুষে মানুষের জন্য আজপর্য্যন্ত কর্ত্তে পারে নাই, সাফল্য লাভ তো আপনার আমার ইচ্ছাধীন নয়, সেটা অদৃষ্ট" "অদৃষ্ট—ঠিক বলেছ শেখর অদৃষ্ট! ঐটাকে কখন মানি নাই, তাই সেটাই

আজ ভূতের মত এসে আমার ঘাড় ভেঙে দিয়াছে, আমার বুকটাকে চুরমার করিয়া দিয়াছে, আগে কি ভাবতুম জান? যা দেখা যায় না—যা প্রত্যক্ষ করা যায় না—তাই অদৃষ্ট; তা আবার মান্‌বো কি? তখন কার্য্য দেখিলে কারণ অনুসন্ধান করিতাম, ভাবিতাম কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না—সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্রশক্তি, এসব মানিতাম কিন্তু ঐ অদৃষ্টটাকে কখন স্বীকার করি নাই, তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ অদৃষ্ট আমার বিজয় মুহূর্ত্তে আসিয়া দানবের মত জয়মাল্য ছিনাইয়া লইয়া গেল—ওঃ কি পরাজয়! এমন মর্ম্মভেদী পরাজয় সহ্য করা যায় না। যদি প্রথম থেকে রোগী বিগ্‌ড়ে যেত, সে সহ্য হত, যদি হিসাবের ভুলে বা কার্য্যের দোষে সে মারা পড়ত, ভাবতুম ত্রুটীতে গেল—কিন্তু সব শেষ করে এনে এমন জায়গায় এসে হারলুম যে তা আর সারা দুষ্কর!" আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "সালোয়ার জন্য আপনি ভাববেন না তাকে আজ আমি খেতে বসে আকার ইঙ্গিতে অনেকটা বলেছি এবং তাকে এমনভাবে আস্তে আস্তে গড়ে আন্‌ছি যাতে এর আঘাত তাকে বিশেষ না লাগে—তবে এরকম উন্মাদ অবস্থায় এঁকে হঠাৎ দেখ্‌লে একটা দুর্ঘটনা হওয়া অসম্ভব নয়, আর যাইহোক সে বিষয়ে আমরা সাবধান থাক্‌ব। তারপর যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, চেষ্টা করে দেখা যাক্, একান্ত না হয় কি করা যাবে বলুন।" "শেখর! সত্যই তুমি রত্ন! তোমায় পেয়ে যে আমি কি সৌভাগ্যবান্ তা তোমার সামনে বলে তোমায় লজ্জা দেব না। ভগবান্ তোমার ভাল করুন—তোমায় আমি বাঁচিয়েছিলাম—আজ তুমি আমায় এই উন্মাদের কবল থেকে বাঁচিয়ে আমাকে ঋণগ্রস্থ করেছ—তোমার—" "ওকথা বলবেন না—

আপনার ঋণ অপরিশোধ্য—আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, আপনি আমায় যে বাঁচিয়েছিলেন সেটা আপনার মহৎ অন্তঃকরণের জন্য—” প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল—ডাক্তার বলিলেন “এখন তুমি যাও, আমি এখানে আছি, আবার রাত্রি ১২টায় এসে আমাকে ছেড়ে দেবে” আমি চিন্তিতভাবে চলিয়া আসিলাম।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য ঘরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছিল দেখিয়া তাহার কাছে বসিলাম—সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, দাদাবাবু কি মনে, করে আমি বলিলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প কর্ত্তে এলাম” “আমি কি জানি দাদাবাবু যে লোক্ তোমরা, আপনারা কত লেখাপড়া জানো—আমি মুখ্যু গয়লার ছেলে—আমি আর তোমায় কি গল্প বলবো” আমি বলিলাম “চৈতন দা তোমার দেশের কথা বল” একটা খুব লম্বা ধোঁয়া ছাড়িয়া চৈতন্য বলিল “সে সব চাষার ঘরের কথা কি শুন্‌বেন দাদাবাবু, আমি গরীব হোলেও আমার ষোলটা গাই ঘরে ছিল—আমার দেশ ছিল দেপাড়ায়—গোয়াড়ী কেষ্টনগর জান দাদাবাবু—আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম “হাঁ—সেখানে আমার এক কলেজের বন্ধুর দেশ ছিল—একবার গ্রীষ্মের ছুটীতে সেখানে গিছলুম—বেশ জায়গা—” “সেখান থেকে কোশ দেড়েক হবে দে পাড়া—আমার দশ বিঘা জমীও ছিল—ও দেশটায় ধানের তত সুবিধা হয় না বটে তবে আউস ধান কিছু হয়—তা যা হোত তাতে আমার সম্বচ্ছর চলে যেত—আর হোত মুলো বেগুন পটোল

সরষে তামাক—আর লাউ কুমড়ো এগুলা উটোনেই হোত ও দেশটায় জলের তেমন জুত নেই দাদাবাবু নইলে যে মাটী যেন সোণা—মাটী খুঁড়তে বড় কষ্ট হোত; দাদাবাবু যখন মূলোখেতের জন্য মাটী ধূলোর মত কর্ত্তুম তখন ভাবতুম এতো মাটীর গুঁড়া নয় এ সোণার গুঁড়ো—দেবতা কিন্তু ছেরকালই যেন দেশটার উপর বিমুখ—বর্ষাতো কখন ভাল করে হোতে দেখি নি—তবুও কষ্ট কখন পাইনি”—বলিতে বলিতে গভীর আবেগে তাহার চোখ দুটী জলে ভরিয়া গেল।

এই বাংলার চাষা—মাটীকে যে সোণার মত দেখে—ধানকে যে লক্ষ্মী মনে করে—ক্ষেতকে পুণ্যভূমি মনে করে—যে ফল-পাকুড়ের বাগানকে ছেলেমেয়ের মত আদর করে—এ সেই বাংলার চাষা—যেখানে বিজাতীয় শিক্ষার আলোক রশ্মি পড়ে এখন সব ছাই হয়ে যেতে বসেছে—যে চাষা তার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি সেই লেখাপড়া শিখে হয় কলকেতায় চাকৃরী কর্ত্তে এসেছে নয় কারখানায় মিস্তিরি হচ্ছে লাঙল ছুঁয়ে সে আর চাষ প্রাণান্তে করে না—এর নাম শিক্ষা! এতো ধ্বংসের মূল! হে শিক্ষিত সংস্কারক “আর শিক্ষাদাও” “শিক্ষাদাও” বলে বাংলার নীরব পল্লীকে মুখরিত করে—তাকে শশ্মানে পরিণত করে সেখানে তোমার জ্ঞানালোকের মশাল জ্বালিয়ে রেখে এস না—শিক্ষায় যখন চারিদিক আলোকিত হবে তখন দেখ্বে পল্লী জনশূন্য—ভূমি কর্ষণাভাবে কণ্টকাকীর্ণ—দীঘি পুষ্করিণী সংস্কার অভাবে মজ্জিত, ম্যালেরিয়া বৃদ্ধিকারী মশকের জন্ম স্থল—দেবমন্দির পূজারীহীন, গোয়ালক্ষেত্র গাভীবৎস্য বর্জ্জিত; আর যা তা কথার আওয়াজে এমন করে দেশটাকে মজিও না। পার ত এমন শিক্ষা দাও যা পল্লী-

বাসীকে সত্যই মানুষ কর্ত্তে পারে, মহৎ কর্ত্তে পারে; যে শিক্ষার প্রভাবে তারা ছুটে গিয়ে আবার জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করে—জাতীয় ব্যবসার উন্নতি করে সঙ্গে সঙ্গে দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ হয় পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হয় আর নত হতে শেখে। তাদের স্বল্পশিক্ষার শূন্য ঔদ্ধত্যে ধরাকে সরা জ্ঞান না করে, তবে দেশ জাগবে তবে দেশের দুঃখ দূর হবে। আর তোমাদের ঐ সাম্যটাকে ছাড়, সাম্য কল্পনার কথা। সব মানুষ সব মানুষের সমান নয় এটা ভুলে যেও না। বাঙ্গলায় সাহিত্য-সেবী অনেক আছেন কিন্তু বঙ্কিম একটী, রবীন্দ্র একটী, শরৎ একটী, তাদের সঙ্গে অন্য সকলকে সমান ভেব না; তা হতে পারে না—হওয়া অসম্ভব। সকলেই যদি নিজেকে অন্যের সমকক্ষ ভাবে তাহলে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্ব্বে কেন? তার কাছে নত হবে কেন? কিন্তু এই নত হওয়াই বড় হবার মূল। নত হতে না শিখ্‌লে—মান্‌তে না শিখলে শৃঙ্খলা থাক্‌বে কি করে? বিশৃঙ্খল সমাজ নিয়ে কি উন্নতি হয় না; কাজ হয়! সাম্যের ঢেউ তুলে আর বিদ্রোহবন্যায় সমাজকে প্লাবিত কোর না। অধীন না হলে স্বাধীন হওয়া যায় না, অধীনতাই স্বাধীনতার ভিত্তি সেটা ভুলে যেও না।

চৈতন্যের কলিকায় আগুনটা বোধহয় নিবিয়া গিয়াছিল সে আবার সেটার অগ্নি-সংস্কার করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল "আর রাজবাড়ীতে দুধ যোগাতুম; আর গাঁয়ের ঠাকুর নৃসিংহদেব—(বলিয়া উদ্দেশে হাত তুলিয়া প্রণাম করিল) তাঁর ভোগের দুধ দিতুম—অধিকারী ঠাকুর আমায় ছেলের মত ভালবাস্‌তেন কতদিন তাঁর বাড়ী লাউটা কুমড়োটা হাতে করে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে এসেছি—সে একদিন গেছে দাদাবাবু—

তারপর কাল হল আমার পয়সা—দুধবেচে কিছু পয়সা করেছিলুম—সেই পয়সা হতেই মনে হল একবার সাগরতীর্থ করে আসি—সেই বেরোনই শেষ—তারপর এখানকার কথা সবই শুনেছ যাক্ এখন বেঁচেছি, পয়সাও নেই ভাবনা চিন্তেও নেই মায়ের কোলে একটু ঠাঁই পেয়েছি বাবাঠাকুর কৃপা করে পায়ে জায়গা দিয়েছেন—চাষ করি খাই-দাই—আপনাদের পায়ের ধূলো নিয়ে বেড়াই—বেশ কেটে যাচ্ছে”—মনে মনে ভাবিলাম চৈতন্য তোমায় পায়ের ধূলা দিবার মত পুণ্য আমি করি নাই বরং তোমার পায়ের ধূলা নিয়ে যদি সর্ব্বস্বের বদলে অমন বুকভরা তৃপ্তি, ভক্তি পাইতো ধন্য হয়ে যাই। চৈতন্যের এই সাধাসিধা ঘটনাবিহীন জীবন-কাহিনীটুকু যে কত মধুর—সোণার বাঙলার শস্যশ্যামল স্নিগ্ধ ছবির মত সুন্দর, তাহাতে যে অনন্ত স্নেহ, পল্লী মায়ের অনন্ত ভালবাসা বিজড়িত ছিল তাহা কেবল মর্ম্মেই অনুভব করা যায়। তারপর হঠাৎ হুঁকা হইতে মুখটা সরাইয়া আমার কাণের কাছে চুপি চুপি বলিল “দাদাবাবু ঠাকুরকে মেরে ফেলেছিল সেই পিচেশটা, সেটাকে আজ সন্ধ্যের আগে বাড়ীর পেছনে ঘুরতে দেখেছি—কি বিতিকিচ্ছিরি চেহারা দাদাবাবু—যদি সন্ন্যাসীঠাকুর হেথা থাক্‌তো তাহলে ঠিক বেটাকে মন্তরের চোটে ধরে বাঁশের চোঙে ভরে গাঙে ফেলে দিত—আচ্ছা দাদাবাবু, বাবা-ঠাকুরও তো যোগযাগ জানেন, ওনারে বলুন না বেটাকে ধরতে, বেটার চাউনিটে যেন কেমন ধারা—যেন সদাই খাঁই খাঁই কচ্চে—আমি কিন্তু বেটাকে ডরাই না—আমার মায়ের পায়ে যদি মতি থাকে তো যমও আমায় ছুঁতে পারবে না বলিয়া গুণ্ গুণ করিয়া গান আরম্ভ করিল—

নিরুপমা-পুরস্কার।

"আমায় ধরতে তুই পারবিনে শমন তোরে আমি ডরাই না—
কালী নামের গণ্ডী দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—পালাই না।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে শুইয়া সন্‌ফিউএর কথা শুনিয়া ভাবিতেছিলাম—চৈতনের মুখে তাহার দর্শন বৃত্তান্ত শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া গেলাম। গতরাত্রে একটা অকারণ নরহত্যা করিয়াও তাহার ভৈরবী বাসনার তৃপ্তি হয় নাই সে যেন অহোরহ শোণিততৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ছুটীয়া বেড়াইতেছে, কি পৈশাচিক জিঘাংসা—সে আরও কি চায়—আর কাহার শোণিতে খর্পর ভরাইবার তাহার বাসনা? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—অনেক রাত্রে একটা বিকট প্রলয় চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল—দেখি ঘামে শয্যা ভিজিয়া জব জব করিতেছে—উঠিবার যেন শক্তি নাই, অজ্ঞাত ত্রাসে হস্তপদ যেন কাঁপিতেছিল মনে হইতেছিল কে যেন আমায় শয্যার সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সে বাঁধন যেন কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছিলাম না—শেষে প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে সেই জড়তা কাটাইয়া উঠিয়া বসিলাম—উপাধানতল হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বাতী জ্বালাইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া দেখি জনমানব নাই—ছুটীয়া সালোয়ার কক্ষের দ্বারদেশে যাইলাম—দেখিলাম তাহা ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ—আমি বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিলাম "সালোয়া ভয় পাইও না—কোন ভয় নাই আমি আছি—

দরজার ফাটাল দিয়া ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে সেও এ চীৎকারে জাগিয়াছে এবং আলোক জ্বালিয়াছে, চৈতন্যের স্ত্রীও সেই ঘরে শুইত—সে বলিল "দাদাবাবু এ কিসের চেঁচানি—কোন অমঙ্গল হয়নি তো—" আমি রুদ্ধশ্বাসে না বলিয়া মাঝের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখি সে দরজা খোলা, তালাটা ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। ডাক্তারও ততক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন "তিনি বলিলেন আজ আবার কি ব্যাপার শেখর—" আমি উন্মুক্ত দ্বার ও ভাঙ্গা তালাটা দেখিলাম—তিনি ঝড়ের মত সেই কক্ষে ঢুকিলেন, হাতে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া বৈদ্যুতিক আলোকটা জ্বলিতেছিল—ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন "শেখর আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমি গিয়া দেখিলাম সমস্ত পিঁজরাগুলি খালি, সবগুলির দ্বারাই উন্মুক্ত রহিয়াছে কেবল সেই জোড়ামানুষটাকে বল্লমের খোঁচা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে; ঘরের মেঝে রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে ডাক্তার উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সেই কক্ষে পাদচারণা করিতে লাগিলেন—তাঁহার সে সময়ের মূর্ত্তি দেখিয়া সেই ঝড়ের রাত্রের কিংলিয়ারের বর্ণনা মনে পড়িল! আমি সযত্নে তাঁহার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিলাম, চৈতন্যও আসিয়াছিল তাহাকে সেই মৃতজীবটার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম—ডাক্তার বাহিরে আসিয়া দালানে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, বুঝিলাম এবারে তাঁহার মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিয়াছে উপর্য্যুপরি আঘাত পাইয়াও যে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি এখনও নৈরাশ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন সেও বুঝি আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; নিরাশার এমন মর্ম্মভেদী ছবি কখনও দেখি নাই। অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন

"শেখর! কি নিদারুণ শত্রু এই সন্‌ফিউ, আমার জীবনব্যাপী প্রয়াসে সংগৃহীত প্রকৃতির অদ্ভুত লীলারূপী এই সব জীবগুলিকে সে দ্বার ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে এখন আর কি তাহাদের ধরিতে পারিব কেবল ঐ জোড়া মানুষটা চলিতে পারে না বলিয়া ওটাকে সে হত্যা করিয়া গিয়াছে এতে তার কোন স্বার্থ নাই কেবল আমার অনিষ্ট করিবার জন্য এই সব করে গেছে" ওঃ যদি তাকে কোন দিন ধর্ত্তে পারি তো সেদিন তারই একদিন কি আমারই একদিন—ভীম যেমন দুঃশাসনের বক্ষ রক্ত পান করেছিল তেমনি করে তার বুকের রক্ত চুষে খেলে তবে আমার রাগ মিটবে—একি শত্রুতা! না আমার কোন দুঃখ নেই বলিয়া ছিন্নজ্যা-ধনুর মত সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন "বলিলেন কোন ক্ষোভ নাই এখন কেবল দ্বন্দ্ব কেবল সংহার—কেবলধ্বংস" বলিয়া উন্মাদের মত উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে চাহিতে চাহিতে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার যদিও খুব ভয় হইয়াছিল তথাপি তাঁহার চিত্ত-দমনের শক্তি আমি জানিতাম তাই আর তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া রোগীর কক্ষে যাইয়া প্রহরায় নিযুক্ত হইলাম। চৈতন্য ইত্যবসরে সেই নিহত জীবটীকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া ঘরটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল "দাদাবাবু আপনার কাছে একটু বোস্‌ব কি আমি বলিলাম "না বরং তার চেয়ে তোমার স্ত্রীকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে বুঝিয়ে দাওগে যে কোন ভয় নাই—সে চলিয়া গেল। এ ঘটনায় সেও খুব কষ্ট পাইয়াছিল কারণ কয়েক বৎসর ধরিয়া সে এই জীবজন্তুর তত্ত্বাবধান করিত সুতরাং তাদের উপর একটা মায়া পড়াও বিচিত্র নহে।

সন্‌ফিউএর প্রতিহিংসা সাধনের কথা যতই ভাবিতে লাগিলাম

ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধির প্রাখর্য্য—অসীম ভরসা আর কার্য্যকারিত্ব শক্তির দৃঢ়তায় মুগ্ধ হইলাম। শত্রু যদি হইতে হয় তো এমনি, সে যে সর্ব্বাংশে এই অদ্ভুত শক্তিশালী ডাক্তার শঙ্করলালের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। সেই সুদূর তিব্বতের দুর্গম গিরিশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করে ভারতের সর্ব্বত্র ছায়ার মত অনুসরণ কোরে তার সব কৌশল ব্যর্থ করে এই দুস্তর জনহীন সাগরসঙ্গম কূলে আসিয়া তাঁহার প্রতি কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আর এর যে এই শেষ নয় তাহাও আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম—এর পরও যে আরও ভীষণতর সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছে তাহাও যেন আমার মনের মধ্যে কে বলিতেছিল। সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে—হার মানিতে সে জানে না—সে হয় প্রাণ দিবে নয় প্রাণ লইবে এমন জেদী শক্তিমান পুরুষ! ডাক্তারের আজ যা অবস্থা দেখিলাম তাতে শেষ পরাজয় যেন তাঁর ভাগ্যেই আছে বলিয়া মনে হইল—কিন্তু কেন এমন হইল—এত শিক্ষা এত অধ্যবসায় এত অনুসন্ধান এত অর্থব্যয় এত সাধনা কিসের জন্য সব বিফল হইতে চলিল—একবার যেন মনে হইল এর মূলে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাই। ডাক্তার তিব্বতে ছদ্মবেশে যাইয়া লামাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহাদের বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া জীবন-রহস্য বিবৃত্ত সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় পুঁথি খানি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আনিয়াছিলেন—ইহা তাহার প্রতিফল নয় তো—ভাবিলাম হবেও বা! সৎকার্য্যের মূলে অসৎ চেষ্টা বিদ্যমান থাকিলেও যে তাহা সুসিদ্ধ হয় না—এ তাহারই ইঙ্গিত নয় তো!

নিরুপমা-পুরস্কার।

পুরাকালে গুরুরা যেমন শিষ্যকে বিদ্যাদান করিয়া গুরু দক্ষিণান্তে শিষ্যকে "তোমার বিদ্যা কার্য্যকরী হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন—এবং সেই আশীর্ব্বাদ ভিন্ন যে বিদ্যাশিক্ষা নিষ্ফল হইত এমন কথা শুনিয়াছিলাম—এ সেই তিব্বতীর গুরুর অপহৃত বিদ্যা কি তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক অভিশাপে নিষ্ফল হইল। বিচিত্র কি! অতি হীন, অতি ক্ষুদ্র, অতি শক্তিহীন দরিদ্রও যখন মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইলে উপর দিকে হাত তুলিয়া বলে "ভগবান্ এর বিচার করবেন" তখন সেই দীনের মর্ম্ম নিবেদনও ভগবানের নিকট উপেক্ষিত হয় না—তার উপর অত্যাচার যে করে সে যখন ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে কৃতকর্ম্মের জন্য দণ্ডিত হয়, তখন সেই মহাসাধক সেই তিব্বতীয় যোগীগণের মর্ম্মদাহের উত্তাপ যে ডাক্তার শঙ্করলালের সব চেষ্টাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবুও কিন্তু ডাক্তারের জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট্ করিতেছিল—ইচ্ছা হইতেছিল যেন এক নিমিষে সব অভাব ঘুচাইয়া দিই—যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সব কার্য্য তাঁহার ইচ্ছামত সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার মুখখানি কৃতকার্য্যতার সন্তোষে পূর্ণ দেখি—অন্যের কাছে তিনি যাই হউন—আমার চক্ষে তিনি দেবতা—তিনি আমার জীবনরক্ষক—আমার অন্নদাতা—আমার মনোরাজ্য-রাণী সালোয়ার প্রতি গভীর স্নেহশীল!

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আরও ৪।৫ দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল—এ কয় দিনের মধ্যে সন্ ফিউএর আর কোন উপদ্রব চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই দেখিয়া যেন আমরা অনেকটা সুস্থ হইলাম। ডাক্তার শঙ্করলালও যেন অনেকটা আহ্লাদিত হইলেন—তবে দুঃসংবাদের মধ্যে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছিল—তাহার পাশবিক প্রবৃত্তি যেন ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতেছিল—চোখের চাহনীটা ঠিক ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হইয়াছিল—অনেক কষ্টে আমরা তাহাকে গৃহাবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলাম—কখনও নিদ্রাকারক ঔষধ প্রয়োগে কখন বা বন্ধন সাহায্যে তাকে আয়ত্তাধীন রাখা হইয়াছিল—তবে সে যে ইচ্ছাশক্তির অধীন আর ছিল না তাহা অবিসম্বাদী সত্য।

সালোয়াকে আমি ইতিমধ্যে এই ঘটনার অনেকটা আভাস দিয়াছিলাম—সে শুনিয়া ধীর ভাবে বলিল "এরকম একটা অনিষ্ট হবে যে তা আমি যেন টের পেয়েছিলুম—আমি স্নেহ-বশতঃই হউক আর স্বার্থবশতঃই হউক শঙ্করলালের এই উদ্ভট সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত দেখিবার আশা করে কি সত্যই অন্যায় করি নি—যা কখনও হয় নাই—বা হতে পারে না তাই সংঘটিত দেখবার আশা সত্য কি অন্যায় নয়! যাক্ ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে—শঙ্করদাদা ও তুমি চেষ্টার কোন ত্রুটী কর নাই তা কি আর আমি বুঝি না, তবে আমার বোধ হয় এরকম উন্মাদ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর মৃত্যুই ভাল ছিল।" "সহস্র বার ; কিন্তু এখন তো তার আর উপায় নেই—যতদিন না এর একটা মীমাংসা হয় ততদিন হয় তো আমাদের এখানেই পড়ে থাকতে হবে—

হয়ত আমাদের জীবনই কেটে যাবে—পারবে—" "কেন পারবো না তোমরা যদি পার আর আমি পারবো না—" "কষ্ট হবে না —" কষ্ট কিসের, পৃথিবীতে আমার কে আছে কার জন্ম কষ্ট হবে—সংসারে যা কিছু আমার প্রিয় তাই যদি হেথা থাকে তবে আমার কি কষ্ট কিছু না—" "আর যদি আমি এখান থেকে চলে যাই—" "ঈস্ যাবে বই কি যাও তো দেখি কেমন তুমি পুরুষ।" বলিয়া ভ্রূভঙ্গে যেন একটা স্থির জয়ের রেখা ফুটাইয়া আমার দিকে এমন ভাবে চাহিল—যা দেখিয়া মনে হইল—সত্যই ইহাকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইবার সাধ্য আমার নাই। আমার চোখের সঙ্গে সমান ভাবে সেই হাস্য-প্রেমোজ্জ্বল চোখ দুটী রাখিয়া বলিল "যাওয়াটা ভাব মুখের কথা নয়—গেলেই হল—মনে করেছ এ সামান্যা নারী এর আমাকে ধরে রাখবার কি শক্তি আছে—তা মনে করো না এটা জন্ম-জন্মান্তরের আকর্ষণ—এ শক্তি উপেক্ষা করিবার সাধ্য কাহারও আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না—আর তা যদি না হবে সতের বৎসর জীবনে কত লোক এসেছে গেছে, কত লোকের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল; কোথাও হল না—আর দেখ তুমি থাকতে কোন দেশে, তোমায় জানতুম না চিনতুম না—...ল ডাক্তারী কর্ত্তে, আর তোমায় জাহাজে দুদণ্ড দেখেই তোমর পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলাম কেন—আর তুমিই বা কেন এ হতভাগিনীকে এত স্নেহের চোখে দেখেছিলে—এটা ঠিক্ তোমার বা আমার খোস-খেয়ালের উপর নির্ভর করে না—তার চেয়ে বড় একটা অদৃশ্য-শক্তি এসব অঘটন সঙ্ঘটন করে—যাকে আমরা বলি "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।" "সত্য সালোয়া—তুমি যা বল্লে অতি সত্য, এতে সত্যই আমাদের হাত

নেই—এখন এস ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের এ বন্ধন চির শুভ, চির প্রেমময়, চির কল্যাণকর হউক; বলিয়া যুক্তকরে উর্দ্ধে সেই অজ্ঞাত অচিন্ত্য মহাপুরুষের উদ্দেশে চাহিলাম। নব-কিশলয়-যুতা পুষ্পিতা-লতার মত যৌবন-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা সালোয়া আমার পদতলে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কি সন্তোষে কি তৃপ্তিতে কি গৌরবে হৃদয় ভরিয়া উঠিল তা হৃদয়স্থ হৃষীকেশই জানেন।

নবজীবনের অমৃতময় আস্বাদনে পুলকিত চিত্তে যখন ডাক্তারের কাছে যাইলাম, তখন তিনি রোগী লইয়াই বড় ব্যস্ত দেখিলাম—তাহার বিদ্রোহীভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে ছিল—এবং নিষ্ফল প্রতীকার চেষ্টায় ডাক্তার ক্রমশঃই পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছিলেন; আমায় দেখিয়া বলিলেন তুমি একে এক ডোজ ওপিয়েম খাইয়ে দাও নইলে আর পেরে উঠ্‌ছিনে”—আমি তখনই তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে বসিলাম কিন্তু সে এমন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে কিছুতেই তাহা খুলিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করাইতে পারিলাম না। দুই কস দিয়া ঔষধ পড়িয়াগেল; ডাক্তার তাহাকে সবলে ধরিয়াছিলেন কিন্তু মাঝে মাঝে সে এমন ঝাঁপাইয়া উঠিতেছিল যে আমার আশঙ্কা হইতেছিল কখন সে আমাদের উল্টে ফেলে দিয়ে ছুটে পালায়—একটু অতর্কিত হইলেই যে সে আমাদের বিধ্বস্ত করিবে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত—আবার কখন কখন বেশ শান্ত ভাবেও থাকিত—তবে সে অতি অল্প সময়ের জন্য। কোন রকমেই তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে না পারিয়া উভয়েই বড় চিন্তিত হইলাম—ডাক্তার বলিলেন এক কাজ কর, মর্ফিয়া Inject করিয়া দাও—উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা সুসাধ্য

বলিয়াই আমি অগত্যা তাহাই করিলাম—ডাক্তার বলিলেন "ব্যস আর কোন চিন্তা নাই—এখন ২৪ ঘণ্টা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত; এখন ওর বাঁধন ছাঁধন গুলা খুলে দিতে পার—তবে খুব সতর্ক হয়ে বসে থাক—আজ অমাবস্যা আমার একটু কাজ সারিয়া লই। তিনি চলিয়া গেলেন, আমি ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া বস্ত্রাদি সংযত করিয়া দিলাম। তার পর বসিয়া বসিয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চেয়ারে বসিয়া একটু ঘুমাইয়া লইব মনে করিলাম; বোধ হয় পনের মিনিটেরও বেশী ঘুমাইনাই—হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেলে দেখি দরজা খোলা মিটি মিটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে কিন্তু শয্যাশূন্য! একি রোগী কোথায় গেল—ঘরের মধ্যে কোথাওত দেখিলাম না। বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার, গাঢ় মসীর মত দুর্ভেদ্য অন্ধকার, সে অন্ধকারে একাকী বাহির হইতে ভরসা হইল না—চীৎকার করিয়া ডাক্তারকে ডাকিলাম—তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন কি হইয়াছে আমি বলিলাম "আমার দোষে সর্ব্বনাশ হইয়াছে রোগীকে নিদ্রিত মনে করে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি কিন্তু উঠিয়া দেখি সে শয্যায় নাই দরজা খোলা" "তবে শীঘ্র এস আর বিলম্ব করিওনা—একটা রিভলবার সঙ্গে নাও চৈতন্যকে ডাক যেমন করিয়া হোক্ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, অন্ধকার বা বন বলিয়া আজ আর নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না। তাহাকে ধরিতে না পারিলে আর কাহারও নিস্তার নাই—।"বলিয়া তিনি বৈদ্যুতিক আলো ও একটা রিভলভার লইলেন, চৈতন্য ও আমি দুজনে দুটা বড় লাঠী লইয়া

ডাক্তার সেইদিকে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিলেন।

বাহির হইলাম প্রথমে বাড়ীর ভিতর চতুর্দ্দিকে দেখিলাম কোথাও তাহার চিহ্ন নাই ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সেই ঘন বন ও গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম কিছু দূরে যাইতেই কর্দ্দমাক্ত পথে পদ চিহ্ন দেখা গেল তাহা অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ সেই ভগ্ন মন্দিরের পথ ধরিলাম—ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলাম মন্দির পার্শ্বস্থ বনমধ্যে তুমুল আন্দোলন হইতেছে—ডাক্তার সেই দিকে আলোক রশ্মি নিক্ষিপ্ত করিলেন—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার মাঝে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক তখন হীরকের মত জ্বলতে লাগল—দেখিলাম বনমধ্যে দুইটা মনুষ্য ধস্তাধস্তি করিতেছে—তাহার একজন আমাদের রোগী দুর্গাদাস ও অপর সেই এক চক্ষু সন্‌ফিউ; আমরা অগ্রসর হইতে চাহিলে ডাক্তার বলিলেন খবরদার এমন কাজ করো না উহারা এখন যে দারুণ হিংসা প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া যুঝিতেছে তাহার সম্মুখে যে যাইবে তাহার মৃত্যু অবধারিত, তবে দুজনের একজনের শেষ না হইলে আর কোন কিছু করা যাইবে না।" আমরা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব মল্লযুদ্ধ দেখিতে লাগিলাম উভয়ের শরীর কণ্টকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন রুধির স্রাবে গাত্রবস্ত্র রঞ্জিত দুজনেই নিঃশব্দে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে যখন একজন ভূপতিত হইয়া পড়িল অন্য তাহার বক্ষোপবিষ্ট হইয়া গলা টিপিয়া ধরিল; আবার তখনই-পতিত ব্যক্তি বিদ্যুদ্বেগে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া উপরে উঠিল—এই প্রকারে উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া শেষে দেখিলাম দুজনেই গড়াইয়া নীচে পড়িল। এটা সেই গাঙের পাড়, নিম্নে বিস্তীর্ণ সৈকত—আমরা অগ্রসর হইয়া পাড়ে দাঁড়াইলাম—দেখিতে দেখিতে দুর্গাদাস বিপুল বিক্রমে

সন্‌ফিউকে টানিতে টানিতে জলে নামিল তারপর একটা ভীষণ চীৎকারে বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল দুজনেই সেই খরস্রোতপ্রবাহে নিমজ্জিত হইল—একবার যেন সন্‌ফিউএর মাথাটা জাগিয়া উঠিল সে একটা দুর্ব্বোধ ভাষায় চীৎকার করিয়া কি বলিয়া উঠিল তাহার পর যেন নিম্ন হইতে প্রবল আকর্ষণে আবার ডুবিয়া গেল—আন্দোলিত জলস্রোত আবার স্থির ধীর প্রবাহে বহিতে লাগিল যেন কোথাও কিছু হয় নাই। আর সেই নৈশ তামসীরাশির মধ্যে সেই নদীকূলে দাঁড়াইয়া আমরা তিনজনে হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম; ডাক্তার যেন মর্ম্মর মূর্ত্তির মত স্থির ধীরভাবে সেই নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার সাহস আমার হইল না। হঠাৎ সেই অরণ্যানী কাঁপাইয়া—সেই ঘন তমিস্ররাশি আন্দোলিত করিয়া সেই বন্যজন্তুর চীৎকারধ্বনি ডুবাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে কে ডাকিল "শঙ্করলাল"—আমরা তন্দ্রাবিষ্টের মত পলকে চাহিয়া দেখিলাম—দীর্ঘদেহ জটাজুটসম্বলিত প্রশস্ত ললাট এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান; তাঁহার চক্ষে বিমল শান্তি, কণ্ঠে অমৃত, হস্তে বরাভয়—ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হইয়া নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "এ আবার কি হইল গুরুদেব।" চৈতন্য "বাবাঠাকুর এসেছ" বলিয়া আমোদে আহ্লাদে গদ গদ হইয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল, আমি ভয়ে ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইলাম।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুগমন করিয়া আমরা সেই ভগ্নমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তিনি আমাদিগকে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন; চৈতন্য মন্দির দ্বার প্রান্তে উপবেশন করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন "শঙ্কর! তুমি আত্মবিস্মৃত হয়েছ। কে তুমি কিসের জন্য ধরায় জন্মিয়াছ সে সব ভুলিয়া যাও কেন—ভগবান্ কি বলেছেন জান?"

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যাধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপিচিন্তয়েৎ॥

অর্থাৎ যদি কোন কারণে, প্রাক্তন কর্ম্ম সংস্কার বশতঃই হউক বা বুদ্ধির ভ্রমজনিতই হউক মন যদি বিচলিত হয় তবে ধৈর্য্যযুক্তকে বুদ্ধিদ্বারা মনকে ক্রমে আত্মসংস্থিত অর্থাৎ নিশ্চল করিবে। অন্য কোন চিন্তা করিবে না কেবল ভাবিবে আত্মাই সব, আত্মাভিন্ন অন্য কিছু নাই এইরূপ মনে আত্মসংহিত না করিলে যোগভ্রষ্ট হইবে—এই যোগের প্রকৃষ্ট পন্থা।" ডাক্তার বলিলেন "প্রভু সে ধৈর্য্য আর আমার নাই আমি যে ধৈর্য্য হারাইয়াছি" "বাতুল! ধৈর্য্য হারাইল কোথায়, ধৈর্য্য কি আত্মা হতে ভিন্ন—সে আত্মার আসন স্বরূপ আত্মা তাহাতেই স্থাপিত তাহা বিস্মৃত হইতেছ কেন?" শঙ্করলাল বলিলেন "প্রভু! এ পরাজয় যে আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি না" "নির্ব্বোধের মত কথা বলিও না শঙ্কর! যাঁর নামে তোমার নাম সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ

সেই পরম পুরুষের নামে কলঙ্ক করিও না—পরাজয় কার, তুমি আমি কি জয় পরাজয়ের কর্ত্তা? তুমি কি ভুলিয়া যাইতেছ—

"নেহাভিক্রমনাশেঽস্তি প্রত্যবায় নাবিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তো মহতাভয়াৎ॥"

এ কর্ম্মযোগ, ইহার প্রারম্ভে বিনাশে প্রত্যবায় নাই, ভগবানের নামে যে মহাকার্য্য আরব্ধ হয় তাহাতে বিঘ্নবৈগুণ্য ঘটিতে পারে না। এই পরম পবিত্র ভারতের উদ্ধারপথ স্বরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অতি অল্পমাত্রায় আরব্ধ হইলেও তাহা নিষ্ফল হয় না; কারণ তাহার ফলাফলের দায়ী আমরা নহি; যিনি কর্ম্মের প্রচেষ্টারূপী সেই পরম পুরুষই তাহার আধার। তবে আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহার কর্ম্মফলে অভিলাষ করিয়া বৃথা আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হইতেছ কেন? যাও উঠ! আর নষ্ট করিবার সময় নাই, সময় নষ্ট না করিয়া শক্তির অপব্যয় না করিয়া নিষ্কাম নিস্পৃহ হইয়া ভগবৎ পদে মতিস্থাপনা করিয়া আত্মসংহিত হও! মোহ পাশ কাটাইয়া হৃদয়স্থ হৃষীকেশের উদ্বোধন কর, শান্তি তৃপ্তির অমৃত পানে অজয় অমর হও।"

অনুতপ্ত শঙ্করলাল বলিলেন "গুরুদেব সত্যই আমি শক্তিসাধনা করিয়া শক্তিগর্ব্বে অন্ধ হইয়াছিলাম—নতুবা এ বৃথা কার্য্যে শক্তি ক্ষয় করিতাম না" ঠিক অনুমান করিয়াছ তুমি কাহাকে দীর্ঘ জীবন নব যৌবন দিতেছিলে, কাহাকে এই জড়দেহকে, এ যে পঞ্চভূতে সৃজিত নশ্বর এর রক্ষার কোন আবশ্যক নাই বরং সেটা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ; তাই প্রকৃতি তোমায় পরাজয় করিয়া প্রতিশোধের হাসি হাসিয়াছেন —আত্মাই জীবের সর্ব্বস্ব সেই আত্মা—পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও তৎসম্বন্ধ

পঞ্চ বিষয় হইতে মুক্ত, তাহা অজর অমর অক্ষয় অব্যয় অচিন্ত্য অক্লান্ত সেই চিরনবীন জরাবার্দ্ধক্যাদির অতীত সেই সত্য সেই চিরসুন্দর তাহাকে দিবার কিছু নাই ; কেবল বুঝিবার ভাবিবার তাহার সহিত মিশাইবার উপায় আছে, অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্থ হইতে যত্ন কর—মুক্তি পাইবে। যাও অদ্য ধীরচিত্তে বিচার করিয়া দেখ—কল্য প্রভাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।” সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে ফিরিয়াই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম ; ডাক্তারের ঘরের দ্বার উন্মুক্ত—গৃহমধ্যস্থ দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি চূর্ণীকৃত—সেই লৌহ-আলমারি ভগ্ন, ডাক্তার দেখিলেন সেই অমূল্য তিব্বতীয় পুঁথি অপহৃত, এককোণে সেই বন্ধুবর কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছেন দেখিয়া বুঝিলাম সেটীকেও নিহত করিয়াছে—পুঁথি সমস্ত ছিন্নভিন্ন শতধাবিক্ষিপ্ত। এসব দেখিয়া ডাক্তার একবার মুখ বিকৃতিও করিলেন না—সমস্ত একত্রিত করিয়া প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত করিলেন তারপর তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াদিলেন—ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে শঙ্করলালের জীবন-ব্যাপী প্রয়াসে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজী বিচিত্রময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি—অদ্ভূত শক্তি-শালী বিবিধ ঔষধাবলী সব ভস্ম-স্তূপে পরিণত হইল—ডাক্তার বসিয়া স্থিরনেত্রে হাস্যমুখে সব দেখিলেন—আমায় বলিলেন “শেখর কাল তুমি সালোয়াকে বিবাহ করিয়া এদেশ ত্যাগ কর—আমার দশ লক্ষাধিক মুদ্রার সম্পত্তি জগতের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, তৎসমুদায় তোমার নামে দানপত্র করিয়া সালোয়ার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দিয়াছি—আর

দুর্গাদাসের প্রায় ক্রোর টাকার সম্পত্তি ত তোমারই হইল—তোমরা স্বদেশে ফিরিয়া পরমসুখে কালাতিপাত কর—আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও—আমাকে বিস্মৃত হও—আজ হইতে আমি মৃত, জগতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই—ভুলিয়া যাও যে শঙ্করলাল বলিয়া কেহ ছিল!—" বলিয়া সেই ধূলার উপর শুইয়া পড়িলেন—শুইয়া শুইয়া বলিলেন "চৈতন্যকেও সঙ্গে লইও—ওকে আর বৃথা এদেশে আট্‌কাইয়া রাখিতে চাইনে" "ও আজ্ঞে কর্ব্বেন না, বাবাঠাকুর—আমি আর কদিনই বা বাঁচব—আপনার চরণ ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে—আমায় পায়ে ঠেলবেন না—যমের ঘর থেকে ফিরিয়ে এনেছেন—আপনার দয়ায় আমার আর কোন ভাবনা নেই—আমি আর সে সংসারের ঝঞ্ঝাটে যাব না" ডাক্তার উদাসীনের মত উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তবে তুমি থাক—মায়ের মন্দিরের সেবার ভার তোমার রইল—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। আমরা ভক্তিপূর্ণ নেত্রে সেই ধ্যানরত মহাপুরুষের পদপ্রান্তে প্রণাম করিলাম। জানি না পৃথিবীতে আর শঙ্করলাল জন্মিবে কি না? তবে জীবনে যাহা দেখিলাম তাহা পঞ্চাশ বৎসরেও ভুলিতে পারি নাই—এখনো চক্ষু মুদিত করিলে সেই ধ্যানমগ্ন মুদিত নেত্র সৌম্যশান্ত মহাপুরুষের স্নিগ্ধ-হাস্যোজ্জ্বল মুখ মনে পড়ে—আর কি সে মুখ দেখিতে পাইব আর কি বাংলায় শঙ্কর জন্মিবে—আবার কি সেই বিপুল কর্ম্মশক্তি সেই অদম্যতেজ সেই গর্ব্বিত বৈজ্ঞানিক সেই তীক্ষ্ণ সত্যানুসন্ধী মহাপুরুষ দেখিতে পাইব। ভবিষ্যতের তিমিরময়ী গর্ভ হইতে কে বলিল "হাঁ—আবার আসিবে।" তবে তাই হোক মা! আবার শঙ্করের মত কর্ম্মযোগীর আগমনে তোমার ক্রোড় অলঙ্কৃত

হউক—আমরা দেখিয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধায় গর্ব্বে তোমার চরণ কমলে মস্তক নত করি।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আর বলিবার কথা কিছু নাই। পরদিন সেই সন্ন্যাসী আমাদের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন—শঙ্করলাল হাসি হাসি মুখে দুর্গাদাসের ও নিজের উইল দুখানি আমাদের যৌতুক দিলেন। চৈতন্য অনেক চেষ্টা করিয়া একখানা নৌকা যোগাড় করিয়া ছিল—তাহাতে আমরা আরাকান যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে কলিকাতায় আসিব এইরূপ স্থির হইয়াছিল—চৈতন্যের স্ত্রী সালোয়ার হাত ধরিয়া অনেক কাঁদিল—চৈতন্য অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "দাদাবাবু মাঝে মাঝে গয়লার ছেলেকে মনে করো—তোমাদের কত কষ্ট দিয়েছি" আমি ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলাম "চৈতন্য তোমায় ভুলিবার যো নাই—তোমার মতন মানুষ আমি জীবনে এই একটীই দেখিয়াছি—আর কখন যে দেখিব তা মনে করি না—তোমার যত্ন তোমার আদর তোমার সরলতা চিরদিন মনে থাকিবে তুমি সত্যই আমার দাদা" বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম—সে বন্ধন মুক্ত হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। কেবল নির্ব্বিকার দেখিলাম শঙ্করলালকে।

নৌকায় আরোহণ করিলে তীরে চৈতন্য ও তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—এমন সময় দেখিলাম সন্ন্যাসী ও শঙ্কর উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন—উভয়েই হস্তোত্তলন করিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নৌকা ছাড়িয়াদিল ক্রমশঃই তীরস্থ মূর্ত্তিগুলি অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র হইতে

ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল—পরে অদৃশ্য হইল—তখন হঠাৎ একসঙ্গে দুইটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস যেন দুজনের বুক ভাঙিয়া বাহির হইল—এ কি প্রিয়জন বিরহ-জনিত দুঃখের চিহ্ন না অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির চরণে আমাদের শেষ কৃতজ্ঞ-পুষ্পাঞ্জলি ?

* * * * *

ইহার পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রভূত অর্থশালী হইয়া পসার জমাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই—এখন আমি এখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্জ্জন—আমার স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত নাই—! অর্থেই অর্থ সমাগম হয় সেটা অতি সত্য—এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের অভাবে আমার কোন ক্লেশই হয় না। বর্ম্মা হইতে দাদার সংবাদ লইয়াছিলাম—তিনি এখন আর ইহলোকে নাই—সুতরাং তাঁর স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্নেহের ঋণ শুধিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সালোয়াকে লইয়া পঁচিশ বৎসর পরমসুখে সংসার যাপন করিয়া অবশেষে তাহাকে হারাইয়াছি—সেও আমায় একাকী ফেলিয়া পরমপিতার চরণে আশ্রয় পাইয়াছে। তাহার লোকান্তর গমনের পর চিত্ত কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হয় তাই একখানা ষ্টীমার চার্টার করিয়া একবার সেই সাগরসঙ্গমে গিয়াছিলাম—গিয়া দেখি সমুদ্র প্রবল হইয়া সে-সমস্ত গ্রাস করিয়াছে—কোথাও সে পুরী বা সে ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন নাই ; সমস্তই কালচক্রের আবর্ত্তনে লুপ্ত। সুতরাং আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিঃসঙ্গ ভগ্ন-জীবন কাটাইতেছি—এখন পরসেবাই আমার ব্রত—ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছি ; কেবল একান্তে বসিয়া সালোয়ার সহিত পূর্ণমিলনের অপেক্ষা করিতেছি।

সম্পূর্ণ।

প্রকাশক—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
৭৩ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বঙ্গের উদীয়মান চিত্রশিল্পী—
শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু
কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

প্রিণ্টার—বিজয়কৃষ্ণ দাস।
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস।
১৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন,
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা।

আমার কথা।

নিরুপমার প্রচারকগণ আমার এই উপন্যাসখানিকে মনোনীত করিয়া পরম বাধিত করিয়াছেন।

এখানি আমার নিজস্ব রচনা নহে—ষোল বৎসর পূর্ব্বে পঠিত একখানি ইংরাজী উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে রচিত—রচয়িতা সুবিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক গায় বুথবী সাহেব—যতদূর স্মরণ হয় বইখানির নাম ছিল "ডাক্তার নিকোলার এক্সপেরিমেণ্ট।"

বইখানি আমি অনুবাদ করি নাই—স্মৃতির কঙ্কালটুকুকে বাংলার অতুল ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালীর নিজস্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছি সার্থকতা কতটুক হইয়াছে তাহা চিরসহিষ্ণু পাঠকপাঠিকাগণের বিচার্য্য।

ঘটনার অস্বাভাবিক অনেক বিষয়কে আমি স্বাভাবিক করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পুস্তকস্থ সামাজিক ও নৈতিক মন্তব্যের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী; আমি নিজে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি—তবে কোন মতামতই যখন সর্ব্ববাদী সম্মত হয় না এগুলিও হইবে না, কিন্তু যতক্ষণ না কোন যোগ্য ব্যক্তি আমাকে অন্যরূপ বুঝাইয়া দিতে পারেন ততক্ষণ এ মন্তব্য প্রকাশে আমি অধিকারী।

পুস্তকের নবম ফর্ম্মার প্রুফ্ দেখিবার সময় জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম ঠিক এই ঘটনাবলম্বনে বাঙ্গালায় আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; হইলেও আমার অনুমান দু'একটী প্রধান চরিত্রের সামঞ্জস্য ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের সহিত কোনরূপ ঐক্য থাকিবে না।

বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাকর প্রমাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই নাই—দ্বিতীয় সংস্করণে সেটুকু দূর করিয়া—চিত্রসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া কলানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার সন্তোষ বিধানে যত্নবান থাকিব।

শারদীয়া
১৩২৯

বিনীত—
রচয়িতা

প্রকাশকের "নিবেদন।"

ষষ্ঠ বর্ষের নিরুপমা পুরস্কার প্রকাশিত হইল। এবারে ক্ষুদ্র গল্পের পরিবর্ত্তে একখানি উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসকে চিত্রভূষিত করিয়া নিরুপমার অদৃষ্টবিধাত্রী পাঠিকাগণের করকমলে দিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া বড় সন্তোষ—বড় তৃপ্তি পাইয়াছি।

এ যাবৎ কোন কোন তৈল প্রচারকই উপহারের জন্য এরূপ সুমুদ্রিত সুরচিত সুচিত্রিত পুস্তক প্রকাশে সক্ষম হয়েন নাই—এটা কেবল আমাদের গৌরব নহে—যাঁদের করুণায় নিরুপমা এ গুরু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে সক্ষম—সেই বাঙ্গালায় কেশতৈল বিলাসী ও বিলাসিনীগণেরও আনন্দের কথা। তাঁদের সাহায্য ব্যতীত এ ব্যাপারে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতাম না। কেশতৈল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির হেতুভূত হওয়াটা কি গর্ব্বের কথা নয়?

রচয়িতা আমাদের জনৈক শ্রদ্ধের বন্ধু ও সাহিত্য জগতে একান্ত অপরিচিত নহেন—আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া এই অদ্ভুত লোমাঞ্চকরঘটনাবিজড়িত কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস খানির এক সহস্র প্রকাশের অধিকার দিয়া আমাদের স্নেহের ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন কারণ এ পুস্তক স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাঁহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইত।

চিত্রের জন্য বাঙ্গালায় উদীয়মান চিত্রশিল্পী শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ বসুর নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকিলে এত সত্বর চিত্রের অঙ্কন ও প্রস্তুত করণ হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

লক্ষ্মীবিলাস প্রেসের লক্ষ্মী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র গোড়া কাটিয়া আগায় খুব জল ঢালিয়াছেন—আর সেই জল যোগাইয়াছেন তাঁহার প্রাইমমিনিষ্টার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু—এঁদের ধন্যবাদ দিতে হইবে কারণ শেষে এই জল না পড়িলে এ বৎসর আর মুখদেখান ভার হইত।

আগামী বৎসরের জন্য এমন একটা আয়োজন হচ্ছে যা পেরে উঠব কিনা জানিনা তবে দেশের ভাই বোনেদের শুভইচ্ছার উপর নির্ভর করে অকূলে ঝাঁপ দিলাম।

অনুগত—

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি।

নিরুপমা পুরস্কারের পরিবর্ত্তে আগামী বর্ষ হইতে এই বাষিক প্রকাশিত হইবে। ইহা ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার হইবে ও ন্যূন কল্লে দশখানি বহুবর্ণ চিত্র দশখানি দ্বিবর্ণের দশখানি এক বর্ণেরও দশখানি ব্যঙ্গ চিত্র থাকিবে—এতদ্ব্যতীত ইহাতে ছোট গল্প, হাস্য কবিতা, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি বিবিধ মনোরঞ্জক বিষয়ের অবতারণা করা হইবে। চিত্রের জন্য বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের সাহায্য লওয়া হইবে—রচনার জন্য প্রত্যেক ক্ষমতাশালী রচয়িতা ও রচয়িত্রীর রচনা গৃহীত হইবে। একজন নামজাদা শিল্পীর যা' তা' ছবি বা কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের যাচ্ছেতাই রচনা আমরা প্রকাশ করিব না। কারণ বিগত ছয় বৎসরে অখ্যাতনামা রচয়িতা ও রচয়িত্রীর যে সকল রচনা আমরা সাধারণকে উপহার দিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই অল্পকাল মধ্যে আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন দেখে অনুমান করেছি যে আমাদের বিচার ও প্রতিভা-নির্দ্ধারণ অসঙ্গত হয় নি।

পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব ও উচ্চ আদর্শ (High Standard) রক্ষণে আমরা যত্ন চেষ্টা বা অর্থব্যয়ের কোনরূপ ক্রটী কর্ব্বনা। এরূপ উদ্যম ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী পারফিউমার করেছেন বলে মনে হয় না—তবে দেশকালপাত্র অনুসারে এরূপ একটা উদ্যমের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে এই শ্রম ও ব্যয়সঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সাবান ব্যবসায়ী মেসার্স এ, এণ্ড এফ্ পিয়ার্স কোং লিমিটেড এইরূপ Annual বা বর্ষস্মৃতি প্রকাশ করে বিক্রয় করেন। এরূপ পুস্তক প্রকাশে বহু ব্যয়বাহুল্য ঘটে সুতরাং

এতদিন যেরূপ মাত্র একটাকা একশিশি তেলের সঙ্গে বিনামূল্যে উপহার দিতাম—এবার আর তা পারবো না, তবে একাজে আমরা কোনও রকম লাভ রাখ্‌বো না পুস্তক প্রকাশে যা সঠিক ব্যয় হবে সেই অনুপাতেই পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত হবে। এই মূল্যের কথা আগামী বৎসরের শ্রাবণ মাসের মাসিক পত্রিকাতে বিজ্ঞাপিত হইবে। পুস্তক পূর্ব্ববৎ শারদীয়াতেই প্রকাশিত হইবে—তবে এ সম্বন্ধে আর স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপন করিয়া ব্যয় বাহুল্য করিব না। যাঁহাদের রচনা পাঠাইবার ইচ্ছা হইবে—আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ছোট গল্প, ব্যঙ্গচিত্র, কৌতুককণা, রহস্য কবিতা বা চিত্র পাঠাইতে পারেন—তন্মধ্যে যে সকল গ্রহণ যোগ্য হইবে উপযুক্ত মূল্যদানে গ্রহণ করিব।

নিরুপমার গ্রাহক গ্রাহিকাগণ।

আপনাদের দয়া আমরা ভুলি নাই, ভুলিতে পারিব না। তাই আপনাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিল। এখন হইতে আমাদের বিক্রীত 'নিরুপমা' 'হিমানী' 'ভেলভেট ক্রীম' প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে একটী করিয়া "কুপন" দিব - ঐ কুপন, সকলে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। আগামী ১৩৩০ সন ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে প্রত্যেক পঁচিশ খানি ঐরূপ কুপন সহ আমাদের কার্য্যালয়ে আপনার নামধাম পাঠাইলে প্রেরকের নিকট রেজেষ্ট্রী পার্শ্বেলে একখণ্ড নিরুপমা বর্ষস্মৃতি প্রেরিত হইবে।

মফঃস্বল বিভাগের নিয়মাবলী।

১। আমরা কাহাকেও ধার দিই না—ভিঃ পিতে মাল পাঠাইতে হইলে আনুমানিক অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে হইবে।

২। যেদিন মাল পাঠান হইবে সেদিনকার বাজার দর লওয়া হইবে।

৩। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্যাকিং, মাশুল ভিঃপিঃ কমিশন মুটে বা গাড়ীভাড়া, পার্শ্বেল পাঠাইবার খরচ, হুণ্ডীর ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি সমস্ত ক্রেতাকে দিতে হইবে।

৪। পার্শ্বেল ডাকঘরে বা রেল ষ্টেশনে পৌছাইয়া দি[illegible] আমাদের সর্ব্বপ্রকার দায়ীত্বের শেষ হইল। পথিমধ্যে ভগ্ন হইলে খোয়া যাইলে বা কোনরূপ লোকসান হইলে, আমরা দায়ীত্ব লইতে অক্ষম—পার্শ্বেল লইবার সময় অবস্থা সন্দিগ্ধ বোধ হইলে বিশেষ করিয়া দেখিয়া ওজন মিলাইয়া বা বহনকারীগণের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সম্মুখে খুলিয়া চালানের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে; পার্থক্য দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ বহনকারীগণের নিকট দাবী করিতে হইবে।

৫। অর্ডার লিখিত মাল বাজারে না পাইলে তৎস্থানে কোনরূপ পরিবর্ত্তনদ্রব্য দেওয়া আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ থাকিবে—এবং প্রেরণ সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ থাকিবে আবশ্যক অনুযায়ী আমরা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিব—তজ্জনিত ক্ষতি হইলে তজ্জন্য আমরা কোনরূপ দায়ী হইব না।

নিরুপমা (হাউগোল্ড) পাঁইট মূল্য	।০	ডজন	১২৲
„ পপুলার ৫ আ: „	১৲	„	১০৲
গোলাপগন্ধ নিরুপমা (Rose-de-Shiraz) মূল্য	১।০	ডজন	১৩৲
যূথিকাগন্ধ „ (Jasmine.exquiste) „	১৲	„	১০৲
ভায়লেটগন্ধ „ (Violet-sublime) „	১॥০	„	১৫৲
মধুমালতীগন্ধ„ (Sweet-Briar) „	১।০	„	১৩৲
শতদলগন্ধ „ (Ideal-Lilly) „	১৲	„	১০৲
রয়েল „ „	১৲	„	১০৲

এই সকলগুলিই পরিমাণে ২ আউন্স মাত্র।

এই গুলির গন্ধ কত মধুর ও কত স্থায়ী তাহা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নহে। ব্যবহারেই বিশেষ পরিচয় পাইবেন।

আর এক সুবিধা,—অপছন্দে মূল্য ফেরত।

যদি নিরুপমা ক্রয় করিয়া উহা আপনার রুচির অনুরূপ বোধ না হইলে বা কোন অংশে ঠকা হইয়াছে মনে করেন তবে উহা খরচ না করিয়া ফেরত দিলে প্রত্যেক নিরুপমা বিক্রেতা উহা বদলাইয়া দিতে বা নগদ মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকিবেন। কারণ আমরা সন্তুষ্ট ক্রেতা চাই —অসন্তোষের সহিত প্রদত্ত অর্থের আমরা প্রত্যাশী নহি। বলা বাহুল্য এইরূপ উদারসত্ত্বে আজ অবধি কোন কেশতৈল বিক্রীত হয় নাই।

ক্যাষ্টর অয়েলের কথা —

ঈগল মার্কা ক্যাষ্টর অয়েল

কেশে যাহারা ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন—বাজারে যতগুলি ক্যাষ্টর অয়েল প্রচলিত তন্মধ্যে কয়েকটী সাহেব বাড়ীর অয়েল ছাড়া আর কোনটীকেই "চলতি" বলা যাইতে পারে না; তার কারণ হচ্ছে দেশীয় তৈল প্রস্তুতকারীগণ ক্যাষ্টর অয়েল সুপরিস্কৃত করিতে জানেন না। তাঁহাদের ক্যাষ্টর অয়েল মাথলে

লইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা। ডজন ২৷০ আনা। গ্রোস ২৫৲ টাকা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র। কোন কমিশন নাই।

২৪ তোলার টীন ১নং লাল লেবেল—মূল্য ২৲ টাকা, ডঃ ২২৷০।

২৪ „ টীন ১নং বি হরিদ্রা লেবেল—„ ১৸০ ডঃ ১৯৷০।

কড়া মাদ্রাজী নস্য।

মাদ্রাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত তামাক হইতে নিপুণ নস্যপ্রস্তুত-কারীগণের সুকৌশলে প্রস্তুত; এই নস্য বাজারে বিক্রীত নস্য অপেক্ষা বর্ণে, গন্ধে ও দানায় কত উৎকৃষ্ট, তাহা একটীবার লইলেই উপলব্ধি হইবে। সস্তার খাতিরে খুচরা দোকানের যা'তা' নস্য কিনিয়া নাসারন্ধ্রের পরকাল নষ্ট করিবেন না।

মূল্য—২৪ তোলার টীন ৸৵০ আনা, ডজন ৯৷০ টাকা। ১২০ তোলার বিস ১ টীন ৩৷০ টাকা, ডজন ৩৯৲ টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

মাদ্রাজে তিল তৈলে রন্ধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং তথাকার শত ধৌত খোলাবিহীন কৃষ্ণ তিল হইতে প্রস্তুত তৈল যে বাঙ্গালা দেশের শোরগোজা, চীনাবাদাম প্রভৃতি ভেজাল মিশ্রিত তিলতৈলাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই বিশুদ্ধ কাঁচা-কৃষ্ণ-তিল তৈলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক, কেশপোষক গন্ধ ও ঔষধি সংযোগে প্রস্তুত, এই মহাসুলভ তৈল যে দরিদ্র বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহারের ও আদরের দ্রব্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি পাঁইট ১৲, ডজন ১০৲, ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

কস্তুরী-গন্ধ মূল্য—
প্রতি শত ১৲
পুন্নাগ ৸৵০ „ „
অম্বর ৸০ „ „
অগুরু ॥০ „ „
তিনশতের কম ভিঃ পিতে পাঠান হয় না। একত্রে এক হাজার লইলে টাকা প্রতি ৵০ কমিসন দেওয়া হয়।

সভ্যতাচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া আজ বাঙ্গালী অলস, অকর্ম্মণ্য ও বাবু'র জাতি হইয়াছে—তাই সন্ধ্যায় আজ সব ঘরে ধূপ ধূনা গঙ্গাজল পড়ে না —আকাশ ভরিয়া তেমন পূত সুগন্ধ উত্থিত হয় না—তেমন আর ঘরে ঘরে শাঁক বাজে না। এখন দূষিত বায়ু শোধন জন্য আমরা অর্থব্যয় করিয়া ফিনাইল, ন্যাপথলিন; কার্ব্বলিক প্রভৃতি আনিয়া ঘরে ছড়াই ও সেই উগ্রগন্ধ ঘ্রাণে ধন্য হই। ধূপ তৈয়ার করিতে যে অনেক পরিশ্রম। যাহাতে সকলে আবার এই সুন্দর প্রাচ্য বিলাসদ্রব্য সহজে ব্যবহার করিতে পারেন, সেজন্য আমরা চন্দনবৃক্ষবহুল সুদূর মহীশূর দেশে ধূপ প্রস্তুতের একটী বিস্তৃত কারখানা খুলিয়াছি এবং বঙ্গবাসী শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে আমাদের প্রস্তুত এই ভারতীয় ধূপ, চীন জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, এবং সভ্যতার লীলাভূমি ইংলণ্ডেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে—অথচ বাঙ্গালীর নিকট তাহার সম্যক আদর হয় না।

ধূপ ব্যবহারের উপকারিতা—ধূপের ধূমে দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়, সংক্রামব্যাধির বীজাণু বায়ুস্তর হইতে দূরীভূত হয়, গৃহ সুগন্ধে আমোদিত হয়, গৃহমধ্যে মশা, মাছি, আরসুলা প্রভৃতির প্রাচুর্য্য নিবারিত হয়। বিলাতী ডিস্ইনফেক্ট্যান্টের চেয়ে বেশী কাজ হয়, অথচ এর সুগন্ধ সে দিতে পারে না।

এক্‌ষ্ট্রাট কেওড়া লিকুইড্

বা

কেওড়ার ঘনীভূত তরলসার।

প্রাচীন-প্রথার উপর আধুনিক বিজ্ঞানের জয়চিহ্ন। ইহা অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, অধিকন্তু কেওড়া জলের ন্যায় ইহা শীঘ্র বিকৃত হয় না। ইহা সরবৎ আইসক্রীম, পুডিং, প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সংযুক্ত হইয়া খাদ্যে অমৃতের আস্বাদ আনয়ন করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ ডজন ৫৲।

গোলাপী কেওড়া।

গোলাপ ও কেওড়ার সম্মিলিত সার।

পানীয় জলে স্বতন্ত্র গোলাপ জল ও কেওড়া জল না মিশাইয়া ইহার কয়েক বিন্দু মিশাইলে পানীয় জলের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই মিশ্রিত জল পানে পেট ঠাণ্ডা থাকে ও পিপাসা নিবারণ হইয়া তৃপ্তির সন্তোষে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়। এতদ্ভিন্ন ইহা সিরাপ, সরবৎ, মিশ্রীরজল, আইসীক্রীম, পুডিং, চাটনী প্রভৃতিতে সংযোগ করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করা যায়। মূল্য ৪ আঃ শিশি ॥৵০, ডজন ৬॥০।
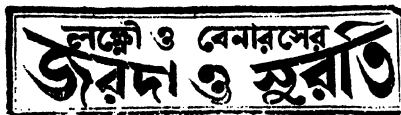
অনেকেই লক্ষ্ণৌএর জরদা বিক্রয় করেন বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা যখন হইতে বাঙ্গালী সমাজে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতেছি তখন কোনও বাঙ্গালী দোকানদার ইহার নামও জানিত না।